৭.১২ মায়ামৃগ – Bangla Library

৭.১২ মায়ামৃগ – Bangla Library

মায়ামৃগ — ১১২

হাঁ, বলো তুমি কে? বললেন নেতৃস্থানীয় স্বনামধন্য ব্যক্তিটি।

শ্রমিক তার মাথায় বাঁধা গামছাখানা খুলে ফেললো, তার সঙ্গে খুলে এলো তার মুখের দাড়ি গোফ।

চমকে উঠলে স্বনামধন্য ব্যক্তি, দুচোখে তার বিস্ময় ফুটে উঠলো। সম্মুখে যমদূত দেখার মত আঁতকে উঠে বললেন–তুমি–তুমি দস্যু বনহুর!

চিনতে ভুল করেননি তাহলে?

তুমি কি করে প্রবেশ করলে আমার বাংলোয়? নিজকে কিছুটা সামলে নিয়ে বললেন স্বনামধন্য ব্যক্তি।

বললো বনহুর–ভুল করছেন আপনি। বনহুরের অসাধ্য কিছু নেই, একথা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না বলে মনে করি।

জানো এই মুহূর্তে আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করতে পারি?

বনহুরের মুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে ওঠে, গম্ভীর শান্ত গলায় বললো সে–জানি কিন্তু পারবেন না, কারণ আপনি এ মুহূর্তে যে অপকর্ম করতে যাচ্ছিলেন তা প্রকাশ হয়ে পড়বে। সে পড়বে আপনার সাধুতার মুখোশ। দাঁতে দাঁত পিষে বললো বনহুর–সে সাহস আপনার নেই। কাউকে এ সময় ডাকতে পারবেন না।.....যাক, এ মুহূর্তে আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলতে চাই না।

এবার বনহুর ফিরে তাকালো তরুণীটির দিকে। তার শরীরে শুধু শায়া ও ব্লাউজ ছিলো, শাড়িটা মেঝেতে লুটোপুটি খাচ্ছে।

বনহুর বললো–বোন, তুমি তোমার শাড়ি পরে নাও। আমি তোমাকে পৌঁছে দেবো তোমার বাসস্থানে।

বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে ছিলো তরুণীটি বনহুরের দিকে। কে এই দেবদূত যার আবির্ভাবে সে চরম এক বিপদ থেকে রক্ষা পেলো? তারপর যখন জানতে পারলো এই সেই ব্যক্তি যার নাম শুনে এসেছে সে বহুদিন থেকে। এই সেই বিস্ময়কর মানুষটি..... দস্যু বনহুর!

তরুণী মেঝে থেকে শাড়িটা তুলে নিয়ে পরে নিলো।

বললো বনহুর–এসো আমার সঙ্গে।

তরুণীর হাত ধরে বনহুর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে।

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন স্বনামধন্য ব্যক্তিটি।

কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে গেছে যেন, যে দুচোখে কিছুক্ষণ পূর্বে ছিলো শার্দুলের লালসা, এই মুহূর্তে সে চোখে ফুটে উঠেছে রাশিকৃত বিস্ময় আর ক্ষুব্ধ ভাব।

বনহুরকে তিনি বাধা দিতে পারলেন না।

তরুণীর হাত ধরে বনহুর চলে গেলো।

যখন হুশ হলো তখন স্বনামধন্য ব্যক্তি নিজ কক্ষের জিনিসপত্রগুলো তচনচ করে ফেললেন। ছড়িয়ে দিলেন টেবিলের কাগজপত্র, তারপর চিৎকার করে ডাকলেন–কে আছে এসো, ডাকাত পড়েছে...... ডাকাত পড়েছে.....

মালিকের চিৎকার শুনে ছুটে এলো বাংলোর পিয়ন, বেয়ারা আর অন্যান্য যারা ছিলো সবাই। স্বনামধন্য ব্যক্তির কক্ষে প্রবেশ করে সবাই হতভম্ব হলো। দেখলো কক্ষে এলোমেলো ছড়িয়ে আছে সব জিনিসপত্র।

স্বনামধন্য ব্যক্তি ব্যস্ত কণ্ঠে বললেন–শীগগীর পুলিশ অফিসে ফোন করো–বাংলোয় ডাকাত পড়েছে..... দস্যু বনহুর হামলা করেছিলো....

দস্যু বনহুরের নাম শোনামাত্র সবার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো। তাকালো সবাই কক্ষের মধ্যে চারপাশে। ছড়ানো জিনিসপত্রগুলো লক্ষ্য করে সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো।

বললেন স্বনামধন্য ব্যক্তি–হা করে কি দেখছো তোমরা? পুলিশ অফিসে ফোন করো....

একজন বললো–স্যার, আপনি তো ফোন করতে পারেন...

পারি কিন্তু দস্যু বনহুর আমার সব হরণ করে নিয়ে গেছে। আমি পারছি না এ মুহূর্তে কথা বলতে।

আচ্ছা স্যার, আমিই করছি। বলেই বাংলো ইনচার্জ অফিসার পুলিশ অফিসে ফোন করলেন।

পুলিশ অফিসে টেলিফোন করার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়লো শহরময়।

নূর গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিলো।

হঠাৎ টেলিফোন বেড়ে উঠলো।

নিদ্রা ছুটে গেলো নূরের, সে শয্যা ত্যাগ করে রিসিভার তুলে নিলো হাতে–হ্যালো নুরুজ্জামান বলছি....কি বললেন মহামান্য অতিথির বাংলোয় দস্যু বনহুরের হামলা......মানে প্রধানমন্ত্রীর রুমে দস্যু বনহুর।

....হ্যাঁ আপনি এক্ষুণি আসুন..... ডাকবাংলোয় চলে আসুন... পুলিশ অফিসে ফোন করা হয়েছে....পুলিশ সুপার স্বয়ং রওয়ানা দিয়েছেন.....

নূর রিসিভার হাতে কিছু ভাবলো, তারপর বললো–আচ্ছা আসছি......রেখে দিলো রিসিভার।

আলনা থেকে টেনে নিলো তার ড্রেস।

নাইট ড্রেস খুলে ছুঁড়ে দিলো বিছানার ওপর।

কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতেই চাকর ছোকরা বললো–স্যার, এত রাতে বাইরে...

হ, জরুরি কাজে বাইরে যাচ্ছি, যতক্ষণ ফিরে না আসি ততক্ষণ জেগে থাকবি।

আচ্ছা স্যার। বললে বয়টা।

নূর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

পুলিশ অফিসে পৌঁছতেই একজন পুলিশ অফিসার ও তার সঙ্গী নুরকে অভ্যর্থনা জানালেন।

নূর বললো–কি ব্যাপার বলুন তো?

ব্যাপার অত্যন্ত গুরুতর। প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের বাংলোয় দস্যু বনহুর হানা দিয়েছে।

সর্বনাশ, এমন ঘটনা ঘটবে ভাবতেও পারিনি। তিনি এসেছেন দেশের দূর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করতে.... আর এমন ঘটনা ঘটলো! কেন, পাহারাদারগণ সবাই কি করেছিলো?

স্যার, সবাই সজাগ ছিলো অথচ....কথা শেষ না করেই চুপ হয়ে গেলেন অফিসার।

বাংলোর কম্পাউণ্ডে এসে দেখলো বিশ–বাইশ খানা গাড়ি বাংলোর সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে এবং পুলিশ ফোর্স ঘিরে আছে বাংলোর চারপাশ।

সবার চোখেমুখেই আতঙ্কের ছাপ।

নূর গাড়ি নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতেই কান্দাইর পুলিশ সুপার নূরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তার সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন পুলিশপ্রধান।

শশব্যস্তে এগিয়ে এলেন মিঃ হাসান, তাঁর মুখমণ্ডলে গম্ভীর ভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। ব্যস্তকণ্ঠে বললেন–মিঃ নূর, এটা আমাদের প্রশাসন বিভাগের কলংক। প্রধানমন্ত্রী এসেছেন দেশের দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করে দুঃস্থ জনগণের জন্য সুব্যবস্থা করতে আর কিনা তারই বাংলোয় দস্যু বনহুরের হামলা। না, এটা কিছুতেই বরদাস্ত করা যায় না।

নূর মৃদু হেসে বললো–এত বেশি উত্তেজিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। চলুন সব শোনা যাক।

নূর এবং মিঃ হাসান ডাকবাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলো।

বাংলোর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে কিছুটা বিস্মিত হলোনর। মহামান্য মন্ত্রী বাহাদুর উদভ্রান্তের মত দাঁড়িয়ে আছেন, তার পাশে মিঃ আহমদ, চোখেমুখে তার বিভ্রান্ত ভাব।

নূর কক্ষে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ আহমদ ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন–মিঃ নূর, এমন দুঃসাহস দস্যু বনহুরের সে পুলিশ পরিবেষ্টিত বাংলোয় প্রবেশ করে মন্ত্রী বাহাদুরকে অপমানিত করে।

মূল গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তার দুঃসাহস সীমাহীন, এ কথা আমরা সবাই জানি। বিস্মিত হবারও কিছু নেই। হাঁ, দস্যু বনহুর কি ক্ষতি সাধন করেছে স্যার?

ক্ষতি? সে আমার কক্ষে প্রবেশ করে আমাকে লাঞ্ছিত অপমানিত করেছে। আমার কক্ষের জিনিসপত্র সব তছনছু করেছে।

স্যার, সে কি উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলো তা কি আপনি বুঝতে পেরেছেন?

হাঁ, বুঝতে পেরেছি, সে চায় না আমি দুঃস্থ জনগণের কোনো উপকার করি। আমাকে সে শাসিয়ে গেলো, আমি যেন অচিরে কেন্দ্রে ফিরে যাই।

ছোট্ট একটু শব্দ করলো নূর–হুঁ।

পুলিশ প্রধান সহ পুলিশ নেতৃবৃন্দ ডাকবাংলোতে দস্যু বনহুরের হামলা ব্যাপার নিয়ে নানারূপ আলাপ–আলোচনা করতে লাগলেন। ঐ মুহূর্তে নূর বেরিয়ে এলো কক্ষ থেকে বাইরে। অদূরে বাবুর্চিখানা, নূর প্রবেশ করলো বাবুর্চিখানায়।

বাবুর্চি তার কাজে ব্যস্ত।

কারণ যে ব্যাপারটা ঘটেছে, তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন তাঁদের চা দেবার আয়োজন করছে সে।

নূর কক্ষে প্রবেশ করতেই বাবুর্চি কুর্ণিশ জানালো, এগিয়ে এলো সে।

বললো নূর–কিছু বলতে চাও?

বাবুর্চি মাথা নেড়ে বললো–স্যার, আপনি বড় ভাল মানুষ তাই....

থামলে কেন, বলো?

স্যার, আপনাদের বড় মানুষের কথা বলতে ভয় পাই.....

ভয় নেই বলো? নূর বাবুর্চির পাশে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো।

বাবুর্চি বললো–স্যার, আমি গরিব মানুষ–এ কথা বললে আমার চাকুরি যাবে আর জেল খেটেও মরতে হবে।

সব আমি সামলে নেবো, তুমি নির্ভয়ে বলো।

বাবুর্চি ঢোক গিলে বললো–স্যার, এক গরিব ভদ্রলোক তার বিধবা মেয়েকে নিয়ে মন্ত্রী। সাহেবের কাছে এসেছিলেন কোনো বিপদে পড়ে, কিন্তু.....

কিন্তু কি, বলো?

স্যার, কি বলবো বলুন, বড় লজ্জার কথা।

নির্ভয়ে বলতে পারো, এতে তোমার কোনো ক্ষতি হবার ভয় নেই বরং উপকৃত হবে। কারণ তোমাদের সাহসী হওয়া দরকার।

এমন করে কেউ বলেনা বলেই আমরা দুর্বল। আপনি যখন অভয় দিচ্ছেন আমি মনে সাহস পাচ্ছি। বলবো স্যার, সব কথা বলবো।

বলো? বললো নূর।

আমি ব্যস্ত ছিলাম রান্নাবান্নার দিকটা সামলাতে–কারণ মহামান্য প্রধানমন্ত্রী এসেছে, তার সঙ্গী–সাথী রয়েছেন, কাজেই ভালভাবে রান্নার জোগাড় করতে হচ্ছিলো। এমন সময় আমার সহকারী এসে বিষণ্ন মনে বললো, একটি বুড়ো মানুষ তার যুবতী মেয়েকে নিয়ে মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে এসেছে। বুড়ো লোকটা কান্নাকাটি করছিলো।

তারপর?

স্যার; ঐ সময় আমি দেখার জন্য এসে আড়ালে দাঁড়ালাম। শুনতে পেলাম মন্ত্রী বাহাদুর বুড়ো লোকটাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আরও লোকজন যারা ছিলেন তারাও এটা সেটা প্রশ্ন করছিলেন শুনলাম। আমি ফিরে আসছি এমন সময় শুনতে পেলাম মন্ত্রী বাহাদুরের ভারী গলার আওয়াজ, তিনি বুড়ো লোকটিকে বলছেন, সন্ধ্যের পর দেখা করবেন, একটা ব্যবস্থা করে দেবো। তারপর স্যার, সন্ধ্যার পর এলো সেই বুড়ো ভুদ্রলোক তার কন্যাকে নিয়ে, কিন্তু ফিরে গেলো একা। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। বাংলো নির্জন, শুধু মন্ত্রী বাহাদুর ভিতরে ছিলেন আর পাহারাদারগণ বাংলোর গেটে পাহারারত ছিলো।

তারপর?

স্যার, তারপর আর বলতে পারবো না। মন্ত্রী সাহেব মদ খেয়ে তার কামরায় কি করছিলেন তিনিই জানেন।

তোমরা কিছু জানো না এরপর কি ঘটলো?

জানি স্যার, আমি রান্না করছিলাম এমন সময় আমার কানে এলো নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ.....স্যার, তারপর যা ঘটেছে তা আমরা কিছু জানি না।

নূর গম্ভীর হয়ে পড়লো, তার মুখমণ্ডল কঠিন আকার ধারণ করেছে। কোনো জবাব না দিয়ে বেরিয়ে এলো আলগোছে।

সবার অলক্ষ্যে মন্ত্রী সাহেবের কক্ষে এসে দাঁড়ালো নূর।

তারকানে এলো মন্ত্রী বাহাদুরের ভয়বিহ্বল গলার আওয়াজ। বলছেন তিনি– এখানে আমার থাকা আর সম্ভব নয়, কারণ পুনরায় সে হামলা চালাতে পারে।

স্যার, আপনাকে এভাবে নাজেহাল করার জন্য আমরাও ভীষণ দুঃখিত। দস্যু বনহুরের উপদ্রব থেকে আপনাকে রক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য। কথাগুলো বললেন মিঃ আহমদ।

রাত ভোর হয়ে এসেছে।

মন্ত্রী বাহাদুরকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত, বনহুরের অন্যায় হামলার ব্যাপারে সজাগভাবে সকলকে মাথা ঘামাচ্ছেন। বড় নিষ্ঠুর বনহুর, মন্ত্রী সাহেব এসেছেন দেশের দুর্গত মানুষের সেবায় অথচ তার ওপর এমন আক্রমণ! পুলিশমহল দুঃখিত,তার সঙ্গে দুঃখিত কান্দাইর জনগণ।

কিছুক্ষণ পর এক সুধী ব্যক্তি বলেন, ভিতরে প্রবেশ করে মন্ত্রী বাহাদুরের পাশে গিয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন। পার্টির লোক বলে কেউ তাকে বাধা দিলো না বা দিতে পারলো না, কারণ পার্টির লোকের সর্বত্র অবাধ গতি।

সুধীজন কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তি।

তার পরিধেয় বসন এবং চলাফেরার ধরন দেখে মনে হয় তিনি ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। এ ছাড়া মন্ত্রী বাহাদুর যার হাতে আছেন তার আবার তোয়াক্কা কিসে। চোখে সুরমা, কাঁধে চাদর, পায়ে দামী জুতো, সেন্টের গন্ধে ভরপুর চারিদিকে।

সুধী ব্যক্তি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন, তারপর কিছু আলোচনা হলো তাদের মধ্যে। সুধী ব্যক্তি বললেন–দুর্গত এলাকার জন্য আপনি ভাববেন না।

যা করতে হয় আমরাই করবো। সাহায্য হিসেবে যে অর্থ আমাদের হাতে এসেছে তার অর্ধেক খরচ করলেই চলবে–বাকি টাকার হিসেবও পাবেন, তার সঙ্গে পাবেন....

থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ওপর আমার বিশ্বাস আছে।

এ বিশ্বাস যেন অটুট রাখতে পারি। বললেন সুধী ব্যক্তি।

মুন্ত্রী বাহাদুর যখন ধনাঢ্য ব্যক্তিটির সঙ্গে আলাপ করছিলেন তখন ভিতরে প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিলো সবার জন্য। এমন কি পুলিশমহলেও প্রবেশের অধিকার ছিলো না।

ওদের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলাপ–আলোচনা চলার পর কলিংবেল বেজে উঠলো।

সহকারী প্রবেশ করতেই বললেন মন্ত্রী বাহাদুর–ফটকের বাইরে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, তাদের ভেতের নিয়ে এসো।

সহকারী বললো–আচ্ছা স্যার! বলে বেরিয়ে এলো। একটু পর কয়েকজন লোককে সঙ্গে করে মন্ত্রী বাহাদুরের কক্ষে প্রবেশ করলো। তারা মন্ত্রী বাহাদুরকে সসম্মানে সালাম জানালো।

সুধী ব্যক্তিটি বললেন–স্যার, এরাই দুর্গত এলাকায় কাজ করছে। এরা খুব সৎ–মহৎ সমাজকর্মী। এরা আমাদের বিশ্বস্ত লোক....

মন্ত্রী বাহাদুর তাকালেন লোকগুলোর দিকে।

ওদের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হলো। যা বলবার বলেন সুধী ভদ্রলোকটি। তারপর হাত দিয়ে ইশারা করলেন তাদেরকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

ইংগিত পেয়ে বেরিয়ে গেলো ওরা।

সুধী ব্যক্তিটি বললেন–স্যার, আপনি কেন্দ্রে ফিরে যেতে পারেন, কারণ এখানে দস্যু বনহুর আপনাকে শান্তিতে থাকতে দেবে না।

ঠিক বলেছেন। দেশের ও দশের শান্তি চায় না সে। সে চায় শুধু অশান্তি সৃষ্টি করতে....কথাগুলো বলে দাঁতে দাঁত পিষলেন মন্ত্রী বাহাদুর।

সুধী ব্যক্তিটি বললেন–স্যার, আপনারা দেশের মঙ্গল চান কিন্তু ঐ নরপশু তা চায় না।

মন্ত্রী বাহাদুর মুখ ভাবগম্ভীর করে বললেন–শান্তি বিনষ্ট করার অপরাধে আমি দস্যু বনহুরকে গ্রেপ্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করছি। এক্ষুণি আমি এ কথা প্রচারের জন্য প্রচার বিভাগকে জানিয়ে দিচ্ছি। আপনি নির্ভয়ে কাজ করুন। দুর্গত এলাকাগুলোর জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ। এবং খাদ্য সামগ্রী যেন ঠিকভাবে বিতরণ হয় এবং আমার কথামত....মানে বুঝতে পারছেন, আমি যা বলেছি সেইভাবে সতর্কতার সঙ্গে.....

স্যার আর বলতে হবে না। সমাজকর্মী, সংসদ সদস্যগণ অতি মহৎ, তারা ঠিকমত কাজ করে যাচ্ছে এবং যাবে। আহা, বেচারা কি পরিশ্রমই না করে যাচ্ছে দেশের দুর্গত এলাকাগুলোর জন্য।

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন–হাঁ, আমি তা জানি এবং সে কারণেই তাদের বিদেশ ভ্রমণের ব্যবস্থা। করেছি। অবশ্য এতে দেশের অধিকতর অর্থ ব্যয় হবে বা হচ্ছে।

হাঁ স্যার, জনগণ এসব ব্যাপার নিয়ে পত্র পত্রিকায় নানারূপ মন্তব্য করছে।

তাতে কিছু যায় আসে না। এক শ্রেণীর লোক আছে তারা এমনি ধরনের উক্তি করবেই। আসলে তাদের এটা অভ্যাস.....

স্যার, জনগণ আরও বলে–সংসদ সদস্যরা শুধু প্রচুর অর্থই বিনষ্ট করছেন না, তারা নাকি দেশের ও দশের সর্বনাশ করছেন... এ ছাড়াও আরও আছে...হাঁ, আরও বলে তারা, সংসদ সদস্যগণ যথেচ্ছাচারিতা করে বেড়াচ্ছেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন, সরকার নাকি তাদের এসব দোষ–ত্রুটি এড়িয়ে চলেন, কারণ তারা যে সরকারের লোক।

অবশ্য কথাগুলো মিথ্যা বলে না তারা। সংসদ সদস্যু হিসেবে যাদের গ্রহণ করা হয়েছে তারা মোটেই সৎ ব্যক্তি নন, কারণ....

স্যার, মন্ত্রীদের ব্যাপারেও জনগণের মনে এরূপই ধারণা। তাঁরাও নাকি বড় অসৎ, তবে হাঁ, সবাই নয়…

সব মিথ্যা! জনগণ যা বলে সব মিথ্যা। আমরা দেশের জনদরদী বন্ধু, হিতাকাঙ্খী…..

হাঁ স্যার, মন্ত্রী বাহাদুরগণ এবং সংসদ সদস্য যারা রয়েছেন সবাই আমরা দেশ ও দশের জন্য ভাবছি তবু দেশের জনগণ সন্তুষ্ট নয়। ওরা যত চেঁচামেচি করুক না কেন আমাদের কোনো ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, কারণ আমরা সরকারের লোক। আমাদের গাড়ি–বাড়ি–ইমারত থাকবেই, থাকবে ব্যাংক–ব্যালেন্স। এ ছাড়া কার ক্ষমতা আছে আমাদের অঙ্গ স্পর্শ করে। অস্ত্রধারী পুলিশ গার্ড সর্বদা পাহারা দিচ্ছে। কারও সাধ্য নেই বিনা অনুমতিতে ভেতরে প্রবেশ করে। স্যার, সত্যি বলিনি?

হাঁ, আপনি যা বললেন তা সত্য। ওরা বলবেই, বলতে দিন। জনগণের কথায় কান দেওয়া মানে বাতুলতা।

কিন্তু স্যার, আমাদের সময় শেষ হয়ে এলে তো আমাদের কোনো পাওয়ার মানে ক্ষমতা থাকবে না, তখন কি উপায় হবে? জনগণ কি তখন আমাদের রেহাই দেবে?

হাসলেন মন্ত্রী বাহাদুর।

সুধী ব্যক্তি আশ্চর্য কণ্ঠে বললেন–স্যার, হাসছেন কেন?

ক্ষমতা শেষ হবার পূর্বেই আমরা তাদের মানে জনগণের দৃষ্টির আড়ালে চলে যাবো।

একি কথা বলছেন মন্ত্রী বাহাদুর! ক্ষমতা লোপ পাবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পরপারে চলে যাবো।

আরে না না, পরা পারে নয়। দৃষ্টির আড়াল মানে কি পরপার? মোটেই নয়, ক্ষমতা লোপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার দেশ ত্যাগ করে চলে যাবো সুদূরে যেখানে দেশবাসী মানে জনগণ নাগাল পাবে না।

হাঁ, এ কথা আমার খেয়াল ছিলো না।

তা থাকবে কেন। আপনারা মনে করেছেন সে পথ পরিষ্কার না করেই চুপ রয়েছি? কাজ করুন সাহেব, নিয়ে কাজ করুন….

*

বোন, বলো কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে? মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালো বনহুর আর তরুণীটি।

তরুণীর মুখ মলিন বিষণ্ন, চুল এলোমেলো। পরিধেয় বস্ত্রের স্থানে স্থানে ছিন্নভিন্ন। জামার হাতাটা ছিঁড়ে ঝুলে পড়েছে।

ভোরের আলোতে স্পষ্ট করে তাকালো বনহুর তরুণীর মুখের দিকে। দুচোখে তার বিস্ময়, লোকটা সত্যি মানুষ বটে। যেমন তার পৌরুষদীপ্ত চেহারা তেমনি বলিষ্ঠ তার কণ্ঠস্বর।

এতদিন সে লোকের মুখে শুনে এসেছে এই মানুষটার কথা। কি ভয়ংকর রূপেই না তার। বর্ণনা শুনেছে সে। আজ তার সব ভুল ভেঙে গেলো। এমন এক ব্যক্তি দস্যু বনহুর ভাবতেও। পারেনি সে কোনোদিন।

তরুণীর চোখ দুটোতে কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠেছে, বনহুরের দিকে নির্বাক নয়নে তাকিয়ে আছে তরুণী। হেসে বললো বনহুর–ভয় নেই, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না। তুমি বলো কোথায় তোমাকে পৌঁছে দিতে হবে?

হীরাঝিলের অদূরে তাপস গ্রামে আমার আব্বা থাকেন…. কথা শেষ করেই থামলো তরুণী।

বনহুর বললো–তাপস গ্রামে তোমাকে পৌঁছে দিলে চলবে তো?

তরুণী কিছু বলতে গিয়ে থামলো আবার।

বনহুর বুঝতে পারলো কিছু বলতে চায় সে। তাই বনহুর একটা উঁচু জায়গায় বসে পড়ে বললো–বসো বোন।

তরুণীর দ্বিধা-ভয়-সংকোচ সব কেটে গেছে।

তার জানতে বাকি নেই লোকটা মহৎ এবং সাহসী।

তরুণী বনহুরের অদূরে বসলো।

বনহুর গামছায় মুখমণ্ডল মুছে নিয়ে চোখ দুটো তুলে ধরলো তরুণীর দিকে–বলো কি বলতে চাও তুমি?

বললো তরুণী–আপনার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে আমি মুগ্ধ। সব বলবো আপনাকে…

বলো?

আমার বাবা একদিন ধনবান ছিলেন। কালক্রমে সব হারিয়েছেন তিনি। আজ আমরা নিঃস্ব। যা ছিলো আমাকে বিয়ে দেবার সময় শেষ হয়ে গেছে।

তোমার বিয়ে হয়েছে।

হাঁ, আব্বা এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। আমার চেহারা নাকি সুন্দর তাই তারা প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন। আব্বা খুশি হয়েছিলেন এ বিয়ের প্রস্তাবে। কিন্তু বিয়ের আসরে বসে দাবি করে বসলেন সোনাদানা আর অর্থ। আব্বা তাদের দাবি সব পূর্ণ করবেন বলে ওয়াদা করলেন। বিয়ের পর সব বিক্রি করে ওয়াদা পূর্ণ করলেন তিনি কিন্তু নিজে নিঃস্ব হয়ে গেলেন। তবু খুশি হলেন না আমার শ্বশুরপক্ষের লোকজন, এমন কি আমার স্বামীও। অকথ্য অত্যাচার চললো আমার ওপর।

তারপর?

একদিন আমাকে আব্বার বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন আমার স্বামী। অসহায় আব্বা কোনো প্রতিবাদ করলেন না। তিনি আমাকে আশ্রয় দিলেন, বললেন–একদিন ভুল ভাঙলে নিয়ে যাবে তোমাকে।

কিন্তু ভুল ভাঙলো না। একদিন জানলাম আমার স্বামী পুনরায় বিয়ে করেছেন প্রচুর ঐশ্বর্যের বিনিময়ে।

ভ্রূকুঞ্চিত হলো বনহুরের, সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো তরুণীর মুখের দিকে।

তরুণী বলেই চলেছে–আমার আব্বা কোনো আপত্তি তুললেন না। তিনি বললেন, মা, সব অদৃষ্ট। যা ভাগ্যে থাকে তাই হবে। আব্বার বাড়ি রয়ে গেলাম কিন্তু গ্রামের কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি আমার আব্বাকে ভীষণ ব্যতিব্যস্ত তারে তুললো। আব্বা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন....

ব্যাপারটা আরও খুলে বলতে হবে! আচ্ছা বোন, তোমার নাম কি এখনও জানা হয়নি কিন্তু...

বললো তরুণী–আমার নাম জাকিয়া সুলতানা।

বনহুর একটু শব্দ করলো–হু। বলো এবার?

জাকিয়া পুনরায় বলতে শুরু করলো–আব্বা অসহায় অবস্থায় পড়লেন, আমাদের দেশবন্ধু সংসদ–সদস্যু সাহেবকে সব বললেন আব্বা, তিনি সব শুনে সান্তনা দিলেন–এর একটা সুরাহা তিনি করবেন। আব্বাকে পরামর্শ দিলেন অচিরে কান্দাই শহর থেকে প্রধানমন্ত্রী আসছেন দুর্গত এলাকাগুলো পরিদর্শন করতে, আব্বাকে একটি কার্ড দিলেন এবং তিনি বললেন এ কার্ডখানা গেটে দেখালে কেউ বাধা দেবে না। আপনি আপনার কন্যাসহ সোজা চলে যাবেন, সব ব্যবস্থা হবে।

আব্বা কার্ডখানা হাতে নিয়ে খুশি হলেন, তার চোখেমুখে আনন্দের ছাপ ফুটে উঠলো। আব্বার মুখভাব লক্ষ্য করে আমার মনে একটা আশার আলো উদয় হলো। তারপর প্রতীক্ষা করতে লাগলাম কবে ঐ দিনটি আসবে। একদিন তারিখটা এলো, আমি ঘুম থেকে জেগে দেখলাম আব্বা তৈরি হয়ে নিয়েছেন। আমাকে তাড়াতাড়ি তৈরি হবার জন্য বললেন।

তৈরি হলাম। ভাল কোনো জামাকাপড় ছিলো না, তাই আমার মৃত আম্মার অতি পুরানো একটা শাড়ি তাই পরে রওয়ানা দিলাম। আমার পরনে যে শাড়ি দেখছেন এই সেই শাড়ি.... কান্নায় ভেঙে পড়লো জাকিয়া।

বনহুর কোনো জবাব দিতে পারলো না, কারণ তার মনটা ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। অসহায় মেয়েটার উপর অমানুষিক নির্যাতন–উঃ কি সাংঘাতিক, সে যেন ভাবতেই পারছে না। বললো বনহুর–থাক আর বলতে হবে না বোন, আমি সব বুঝতে পেরেছি। সরকারের লোক বলে রেহাই পাবে না.....একটু

থেমে বললো বনহুর–এরা সরকার পার্টির লোকের দোহাই দিয়ে দেশের চরম সর্বনাশ করে যাচ্ছে।

আজ দেশ এক চরম মুহূর্তের সম্মুখীন, দ্রব্যমূল্য জনজীবনকে দূর্বিষহ করে তুলেছে, মানুষ আজ অমানুষ হয়ে উঠেছে। ডাষ্টবীনে কুকুর আর মানুষ একসঙ্গে খাবার হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

সত্যি আপনি কত মহান। এমন লোক এখন নেই যারা ন্যায্য ভাবে দেশ ও দেশের জনগণকে নিয়ে ভাবেন।

অবশ্য এ কথা সত্য নয় বোন। সরকার ঠিকই দেশ ও দেশের জনগণকে নিয়ে ভাবছেন কিন্তু কোনোই প্রতিকার করতে পারছেন না, কারণ সরকারের লোক বলে যে সব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি দেশের কাজে নেমেছে তারা শৃগালের মত ধূর্ত। সরকারের চোখে ধূলা দিয়ে দেশ ও দশের রক্ত শোষণ করে নিজেদেরকে সতেজ করে তুলছে। যাক্ ও সব নিয়ে এখন কথা বলার সময় নেই। এবার চলো তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি।

উঠে পড়লো বনহুর।

তরুণীও দাঁড়ালো কিন্তু এ বেশে কি করে সে পথ চলবে! এতক্ষণ রাতের আবরণে ঢাকা ছিলো তার ছিন্নভিন্ন বসন, অপরিচ্ছন্ন বেশ। কিন্তু এখন?

বনহুর বললো–কিছু ভেবো না বোন, আমি তোমাকে সবার দৃষ্টি এড়িয়ে পৌঁছে দেবো তোমার আব্বার ওখানে।

বেশ, চলুন। তরুণী বললো।

চলতে শুরু করলো ওরা।

অনেক পথ।

এক সময় তারা পৌঁছে গেলো শহরের কাছাকাছি। অদুরে কয়েকটি গাড়ি অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার কোনো চায়ের দোকানে চা পান করছিলো।

বনহুর গাড়িখানার দিকে এগুতেই একজন লোক বেরিয়ে এলো চায়ের দোকান থেকে, দেখতে পেলো তার হাতে একটি ব্যাগ এবং একগোছা চাবি।

পাশে একটি মোটর সাইকেল ছিলো, বনহুর তরুণীকে লক্ষ্য করে বললো– আশা করেছিলাম একটি গাড়ি পাবো কিন্তু সম্ভব হলো না, কারণ ঐ ব্যক্তি গাড়িগুলোর পাহারাদার। আমি ঐ মোটর সাইকেলটা নিয়ে আসবো, তুমি প্রস্তুত থাকবে।

তরুণী মাথা কাৎ করে বললো–আচ্ছা।

বনহুর তরুণীটিকে একটু দূরে রেখে এগিয়ে গেলো সেই মোটর সাইকেলটার দিকে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই মোটর সাইকেলটা নিয়ে হাজির হলো, দ্রুতকণ্ঠে বললো বোন তুমি পেছনে উঠে বস।

তরুণী তাড়াতাড়ি উঠে বসলো বনহুরের পেছনে।

মোটর সাইকেলটা স্টার্ট দেওয়াই ছিলো, তরুণী চেপে বসতেই গাড়ি চাড়লো বনহুর। এবার পায় কে তাকে।

কিন্তু অদূরেই ছিলো পুলিশ ভ্যান।

তারা বুঝতে পারলো, সঙ্গে সঙ্গে ওয়্যারলেসে সংবাদটা ছড়িয়ে দিলো ট্রাফিক হেড অফিসে, সমস্ত ট্রাফিক সংবাদ পেয়ে গেলো।

পুলিশ ভ্যানটি ছুটলো মোটর সাইকেলটাকে লক্ষ্য করে।

বনহুর তরুণীটিকে লক্ষ্য করে বললো–পুলিশমহল আগে থেকেই সতর্ক ছিলো তারা আমাকে ধাওয়া করেছে, তুমি সাবধানে বসো, যেন ছিটকে না পড়....

বললো তরুণী–আমি সতর্ক রয়েছি....

পুলিশ ভ্যানটিকে এগিয়ে বনহুর মোটর সাইকেল নিয়ে এ পথ সে পথ দিয়ে চলতে লাগলো।

দ্বিতীয় একটি পুলিশ ভ্যান এবার বনহুরকে ফলো করলো।

ততক্ষণে পুলিশ অফিসে মিঃ আহমদ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, কারণ গত রাতে স্বয়ং দস্যু বনহুর প্রধানমন্ত্রীর বাংলোয় হানা দিয়ে তাকে চরম অপমান করেছে। আজ আবার সেই ব্যক্তি শহরের পথে একজন তরুণীকে নিয়ে উধাও হবার চেষ্টা করছে। এই লোকটি কে? এ ব্যাপারে জানার জন্য পুলিশমহল সজাগ হয়ে উঠেছে। তারা ঠিক বুঝতে পেরেছে এ ব্যক্তিটিই দস্যু বনহুর, তাকে গ্রেপ্তার না করতে পারলে পুলিশ মহলের লজ্জার অন্ত থাকবে না। এ ছাড়াও আছে লক্ষ টাকা পুরস্কার।

পুলিশমহল মরিয়া হয়ে উঠলো।

বনহুর তরুণীসহ স্পীডে মোটর সাইকেল চালিয়ে চলেছে। উল্কা বেগে চলছে, পেছনে দুটো পুলিশ ভ্যান।

সামনে নদী।

বাধা পেলো বনহুর।

পেছনে দুটো পুলিশ ভ্যান। প্রতিটি পুলিশের হাতে রাইফেল, মুহূর্তে মোটর সাইকেল লক্ষ্য করে তরা গুলী ছুঁড়ছে।

এবার বনহুর বিপদে পড়লো।

তবে নদীটা খুব প্রশস্ত নয়, মোটর সাইকেল দিয়ে পার হওয়া যায় তবে পেছনে তরুণীটি থাকায় বনহুর কিছুটা অসুবিধা বোধ করলো কিন্তু বেশিক্ষণ এ নিয়ে ভাববার সময় নেই, দ্রুতকণ্ঠে বললো–বোন, শক্ত করে ধরো আমাকে……

তরুণী বনহুরের নির্দেশমত মজবুত করে বনহুরকে ধরলো।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে মোটর সাইকেল নিয়ে পিছিয়ে এলো, তারপর দ্রুত গাড়ি চুটিয়ে গাড়িসহ নদীর ওপারে গিয়ে পড়লো।

পুলিশ ভ্যানগুলো আটকা পড়লো এপারে।

পুলিশ ফোর্স বারবার তাদের আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলী ছুঁড়তে লাগলো। তারা সবাই গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। সবার মুখে চোখে উত্তেজনার ছাপ।

এপারে পুলিশ ফোর্স ওপারে দস্যু বনহুর।

মোটর সাইকেলে বনহুর আর তরুণী সামান্য সময়ে দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো।

পুলিশ ফোর্স ওপারে পৌঁছে নাগাল পাবে না।

কাজেই তারা ফিরে চললো, তবে ভালভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আবার আসবে।

বনহুর আর তরুণী এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত হলো। তারা তরুণীর পিতার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলো।

তরুণী ভাবছে দস্যু বনহুরের সম্বন্ধে যা সে শুনে এসেছে আসলে সব মিথ্যা। বনহুর মানুষ নয় ফেরেশতা তার আচরণে মুগ্ধ তরুণী, সত্যি এমন জন কেউ হয় না। শুধু শক্তিশালীই নয় সে, বুদ্ধিমানও বটে।

বনহুর একসময় বললো–আমরা বড় ক্লান্ত, কাজেই কিছুটা বিশ্রামের প্রয়োজন।

তরুণী বললো–হ, বড় ক্লান্তি বোধ করছি। তা ছাড়া আপনি নিজেও আমার জন্য....

বনহুর আর তরুণী গিয়ে বসলো একটি গাছের নিচে।

প্রখর রৌদ্রতাপে সমস্ত শরীর ঘেমে নেমে উঠেছে ওদের।

বনহুর তার মাজায় বাধা গামছাটা খুলে নিয়ে মুখচোখের ঘাম মুছে ফেললো।

তরুণী আঁচলে ঘাম মুছছিলো।

বনহুর বললো–বোন, তুমি বড় ক্ষুধার্ত, নিকটে কোনো গ্রাম নেই যে কিছু খাবার পাওয়া যাবে।

হাঁ, তা দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু আমার জন্য ভাববেন না, আপনার নিজের খুব কষ্ট হচ্ছে আমি বেশ উপলব্ধি করতে পারছি। আমাকে উদ্ধার করতে গিয়ে আপনার এ অবস্থা।

মোটেই না। এসব আমার অভ্যাস আছে কিন্তু তোমার জন্য ভাবছি…

আপনি আমার জন্য কিছু ভাববেন না। আমি বড় দুঃখী, সব সহ্য করার ক্ষমতা আমার আছে।

তুমি বসো বোন, আমি দেখি কোনো খাবার সংগ্রহ করতে পারি কিনা। আমরা কান্দাই ছেড়ে বহুদূরে চলে এসেছি। মোটর সাইকেলটারও ক্ষুধা পেয়ে গেছে, বড়জোর সে আর কিছুটা পথ আমাদের এগিয়ে দিতে পারবে।

কথাগুলো বলে বনহুর চলে গেলো।

কিছুক্ষণ পর ফিরে এলো রিক্ত হস্তে।

মুখভার বিষণ্ন মলিন।

বললো বনহুর কিচ্ছু পেলাম না।

তরুণী বললো–চলুন এখানে বিলম্ব করতে মন চাইছে না।

তাই চলো কিন্তু কতটুকু যেতে পারবো জানি না। কারণ গাড়ির তেল শেষ হয়ে এসেছে।

এ বিপদ আরও ভয়ংকর, না জানি কি হবে আমাদের।

সবের উপরে আল্লাহ ভরসা।

পুনরায় গাড়িতে উঠে বসলো বনহুর, পেছনে বসলো তরুণী।

কিন্তু বেশিদূর এগুতে পারলো না তারা।

গাড়ি নিঃশব্দে থেমে গেলো।

বনহুর বললো–এখন আমাদের পায়ে হেঁটে চলতে হবে। পারবে হাঁটতে?

পারবো।

বনহুর আর তরুণী চলতে শুরু করলো।

পেছনে পড়ে রইলো মোটর সাইকেলটা।

*

ওদিকে পুলিশ ফোর্স ফিরে গিয়ে সন্ধানী কুকুরসহ নৌকাযোগে এপারে চলে এলো এবং সন্ধান করে এগুতে লাগলো তারা।

এক একটি কুকুর হিংস্র বাঘের চেয়েও ভয়ংকর।

তারা মাটি এঁকে এঁকে এগুতে লাগলো।

এত দ্রুত তারা এগুচ্ছে যে, কিছু সময়ের মধ্যেই বহুদূর চলে এলো।

যে স্থানে বনহুর আর তরুণী বসে ছিলো সেই স্থানে এসে সন্ধানী কুকুরগুলো মাটি শুঁকতে লাগলো এবং পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগলো।

পুলিশ ফোর্স বুঝতে পারলো ঐ স্থানে তারা বসে বিশ্রাম করেছে। এবার তাদের চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস দেখা দিলো। তারা নূতন উদ্যমে এগুতে লাগলো। কিছুদূর এগুতেই পুলিশ মহল দেখতে পেলো অদূরে সেই গাঢ় লাল রঙের মোটর সাইকেলটা দাঁড় করানো রয়েছে।

পুলিশ ফোর্স তাড়াতাড়ি গাড়িখানার পাশে গেলো এবং তারা বেশ বুঝতে পারলো গাড়িতে তেল না থাকায় ওরা গাড়ি রেখে পায়ে হেঁটে চলেছে। এবার সুবিধা হবে, কারণ সন্ধানী কুকুরগুলো খুঁজে বের করবে ওদের।

বনহুর আর তরুণী পায়ে হেঁটেই চলেছে। তবে তরুণী বেশি পা চালিয়ে চলতে পারছিলো না, তাই পিছিয়ে পড়ছিলো তারা।

হঠাৎ কুকুরের কন্ঠস্বর কানে গেলো বনহুর আর তরুণীর। তরুণী বললো– কুকুরের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি.....

হাঁ, কুকুর তো বটেই তবে সাধারণ কুকুরের কণ্ঠস্বর এটা নয়, এগুলো পুলিশমহলের শিকারী এবং সন্ধানী কুকুরের গলার স্বর। পুলিশ ফোর্স সন্ধানী কুকুর নিয়ে আমাদের সন্ধানে এগিয়ে আসছে। এই মুহূর্তে আমাদের বিপদ

সুনিশ্চিত, আমরা সন্ধানী কুকুরের কবল থেকে রক্ষা পাবো না, কারণ এ কুকুরগুলো অত্যন্ত ভয়ংকর। তাহলে উপায়? ভীতকণ্ঠে বললো তরুণী।

তরুণীর চোখেমুখে ফুটে উঠেছে একটা ভীষণ আতঙ্কের ছাপ।

বনহুর বললো–এখন ভয় পেলে চলবে না বোন।

চলুন ঐ ঝোঁপটার মধ্যে লুকিয়ে পড়ি। বললো তরুণী।

বনহুর বললো–কুকুরগুলো এত বেশি ভয়ংকর যে তারা নাক দিয়ে ঘ্রাণ শুঁকে শত্রু খুঁজে বের করে। এরা আমাদের খুঁজে বের করবেই। কাজেই ঝোঁপঝাড় বা আড়ালে আত্মগোপন করার কোনো উপায় নেই। আর একদণ্ড বিলম্ব করা যায় না, এবার তোমাকে দৌড়াতে হবে।

কথাটা বলেই তরুণীর হাত ধরে দৌড়াতে শুরু করলো বনহুর।

কিছুটা এগিয়েছে, হঠাৎ সম্মুখে দেখতে পেলো একটা অশ্ব আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

মুহূর্তে বনহুরের চোখ দুটো দীপ্ত হয়ে উঠলো।

বললো–ঐ অশ্বটি কার জানি না তবে এ সময়ে আমাদের পরম উপকারে আসবে।

কিন্তু অশ্বের লাগাম বা কোনো কিছু নেই।

তাতে কোনো অসুবিধা হবে না। চলে এসো শীঘ্র। তরুণীর হাত ধরে অশ্বটির নিকটে এগিয়ে গেলো। বনহুর অশ্বের নিকটবর্তী হতেই কেমন যেন বিস্মিত হলো। এ অশ্ব তার পরিচিত মনে হলো।

কিন্তু অশ্ব নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবার সময় নেই তাদের।

পেছনে কুকুরের ভীষণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে এগিয়ে আসছে।

বনহুর দ্রুত অশ্বটার পাশে গিয়ে পিঠ চাপড়ে দিলো।

অশ্বটার চেহারা ছিলো ভয়ংকর ধরনের।

তরুণী ভড়কে গেলো।

বনহুর বললো–এসো বোন, এই অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসো.... বনহুর তাকে অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়ে নিজে উঠে বসলো এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অশ্বচালনা করলো।

বনহুর নিজে অশ্বের ওপরে বসে তরুণীকে বাম হাতে ধরে রাখলো যেন হঠাৎ পড়ে না যায়।

তীরবেগে অশ্বটি ছুটে চললো।

কোথায় চলেছে তাও বনহুর বুঝতে পারছে না।

এটা সম্পূর্ণ অচেনা পথ।

পেছনে শোনা গেলো সন্ধানী কুকুরগুলোর ভীষণ আওয়াজ। তারপর ধীরে ধীরে কুকুরগুলোর কণ্ঠস্বর ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে এলো। শুধু প্রতিধ্বনিত হলো অশ্বখুরের শব্দ।

পুলিশ ফোর্স বুঝতে পারলো যার সন্ধান তারা করে ফিরছে সে অশ্বপৃষ্ঠে চেপে উধাও হয়েছে। তাকে আর পাওয়া যাবে না।

পুলিশমহল ক্লান্ত অবসন্নতারা হতাশ হয়ে পড়েছে। বারবার রুমালে মুখ মুছতে লাগলো তারা।

সন্ধানী কুকুরগুলোর জিভ বেরিয়ে এসেছে।

রীতিমত হাঁপাচ্ছে কুকুরগুলো।

পুলিশমহল এবার ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো।

*

অশ্ব বন-জঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চললো। বনহুর শক্ত করে ধরে রাখলো তরুণীটিকে, যেন অশ্বপৃষ্ঠ থেকে পড়ে না যায়।

বনহুর এবার চেষ্টা করলো অশ্বটিকে থামিয়ে ফেলার জন্য। কিন্তু কিছুতেই অশ্বটিকে থামাতে পারছে না। ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে অশ্বটি, কোথায় চলেছে সেই জানে।

অবাক হলো বনহুর।

তার মনে হচ্ছে এ অশ্বটি যেন তার পরিচিত। হঠাৎ তার মনে পড়ে, হ, তারই আস্তানার এ অশ্ব, এবার ঠিক মনে পড়েছে...এই অশ্ব নিয়েই তো জাভেদ অন্তর্ধান হয়েছিলো। একটা অদ্ভুত আনন্দদ্যুতি বনহুরকে উদ্ভাসিত করে তুললো।

চুপ করেই রইলো বনহুর।

দেখা যাক কোথায় যায় অশ্বটি।

বনহুর তরুণীকে ঠিক ভাবেই ধরে রয়েছে, যেন সে অশ্ব পৃষ্ঠ থেকে পড়ে না যায়।

অশ্ব তখনও উল্কাবেগে ছুটছে।

প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

একটা গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করলো অশ্বটি।

বনহুর বললো–না জানি আজ ভাগ্যে কি আছে। অশ্বটি আমাদের কোথায় নিয়ে চলেছে কে জানে...

তরুণী করুণ কণ্ঠে বললো–আমাকে বাঁচাতে গিয়ে আপনার এ অবস্থা....

কিন্তু অশ্বটা এত বেগে ছুটছিলো যে বাতাসের ঝাঁপটায় কেউ কারও কথা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না, তাই ঠিকমত কেউ কোনো জবাব দিতে পারছিলো না।

হঠাৎ বনহুরের নজরে পড়লো দূরে একটা ক্ষীণ আলোর শিখা।

আলোটা গভীর জঙ্গলের মধ্য হতে বেরিয়ে আসছে।

অশ্বটা সেই আলোর ক্ষীণ শিখা লক্ষ্য করে ছুটছে। ভীষণ বেগে ছুটছে....

জমাট অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন।

অশ্বটা আপন মনে এগুচ্ছে।

বনহুর আর তরুণীর চিন্তা হচ্ছে, না জানি অশ্বটা তাদের কোথায় নিয়ে চলেছে।

কিন্তু বেশিক্ষণ লাগলো না।

আলোর শিখা বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

এতক্ষণ যে শিখা অতি ক্ষীণ দেখাচ্ছিলো তা এখন অতি নিকটে এবং স্পষ্ট।

একটা কুটিরের সম্মুখে এসে অশ্ব থেমে পড়লো।

দীর্ঘ সময় ধরে একটানা ছুটেছে অশ্বটি, তবু একটু হাঁপিয়ে পড়েছিল। অশ্ব নয় যেন একটা যান্ত্রিক জীব। বনহুর অশ্ব থেকে নেমে পড়লো। তারপর তরুণীকে নামিয়ে নিলো অশ্ব থেকে।

ফিরে দাঁড়াতেই তার নজর পড়লো একটি তরুণী প্রদীপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেমুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে।

বনহুর আর তরুণী নেমে দাঁড়াতেই অশ্বটি চি হি চি হি শব্দ করে উঠলো।

প্রদীপ হাতে তরুণী অন্য কেউ নয়–হুমায়রা। অশ্বটি জাভেদের অশ্ব, ওর নাম জাম্বু। জাভেদ নিরুদ্দেশ হবার পর প্রতিদিন জাম্বু চলে যায় দূরে বহু দূরে। কোথায় যায় কেউ জানে না, এমন কি সন্ন্যাসী বাবাজীও জানে না।

জাম্বুর দেহ স্পর্শ করে এমন লোক নেই।

সন্ন্যাসী বাবাজীও জাম্বুকে স্পর্শ করতে পারে না। নিকটে গেলেই লাফঝাঁপ শুরু করে দেয়।

শুধু হুমায়রার আদর সে পছন্দ করে। ও যখন পাশে এসে দাঁড়ায় তখন মাথা দোলায়, মৃদু শব্দ করে।

হুমায়রা ওর পিঠ চাপড়ে দেয় যেমনটি করে আদর করতে জাভেদ। কতদিন হলো সে হারিয়ে গেছে। জাম্বু পশু হলেও তার প্রাণ আছে। কত ব্যথা সে বুকে চেপে নিয়ে প্রতীক্ষা করছে, না জানি কবে ফিরে আসবে সে।

প্রতিদিন চলে যায় দূরে বহু দূরে, সন্ধান করে ফেরে সে তার মনিবের।

হুমায়রা প্রতীক্ষা করে জাম্বুর।

রোজই ভাবে সে, আজ বুঝি ফিরে আসবে ইন্দ্রনাথ।

কিন্তু দিন যায় ইন্দ্রনাথ আর ফিরে আসে না।

আর কোনোদিন ফিরে আসবে কিনা তাও জানে না। হুমায়রার প্রতীক্ষা বৃথা, এটা ভেবে সন্ন্যাসী জ্যোতিষী হাসে। সে হাসির অর্থ বুঝতে পারে না হুমায়রা।

আজও হুমায়রা প্রতিদিনের মত প্রতীক্ষা করছিলো।

জাম্বু দুদিন হলো নিখোঁজ।

সে কোথায় গেছে জানে না হুমায়রা।

তবে সন্ন্যাসী জানে ইন্দ্রনাথের অশ্ব ইন্দ্রনাথকেই খুঁজতে গেছে। যতদিন তাকে না পাবে ততদিন সে ওকে খুঁজে ফিরবে। কিন্তু অশ্বটি জানে না আর কোনোদিন ফিরে আসবে না ইন্দ্রনাথ। আড়ালে অট্টহাসি হাসে জ্যোতিষী।

হুমায়রা অচেনা অজানা একটা লোকও তার সঙ্গে একটি তরুণীকে দেখে অবাক হলো।

হুমায়রা শয্যায় শুয়ে শুনতে পাচ্ছিলো জাম্বুর খুরের আওয়াজ তাই সে প্রদীপ হাতে এসে দাঁড়িয়েছিলো বাইরে। হিংস্র জীবজন্তু তাকে আচমকা আক্রমণ করতে পারে এ ভয় তার ছিলো না। সে মনে করেছিলো জাম্বু হয়তো ইন্দ্রনাথকে খুঁজে পেয়েছে, তাই সে ফিরে আসছে দ্রুতগতিতে।

হুমায়রা প্রদীপের আলোতে দেখতে পেলো জাম্বুর পিঠ থেকে দুজন মানুষ নেমে দাঁড়ালো, একজন পুরুষ আর একজন তরুণী।

প্রদীপের আলোতে স্পষ্ট দেখা না গেলেও কিছুটা দেখা যাচ্ছে ওদের চেহারা।

হুমায়রা প্রদীপ হাতে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর আর তরুণী এগিয়ে এলো।

কম অবাক হয়নি বনহুর গভীর জঙ্গলে এমন একটা কুটির এবং সেখানে একটি সুন্দরী যুবতাঁকে দেখে। কে এই যুবতী মেয়ে?

বনহুর হুমায়রার সামনে এসে দাঁড়ালো।

বললো বনহুর–কে তুমি?

হুমায়রা বললো–আপনারা কে তাই আগে বলুন?

বললো বনহুর–আমরা বিপদগ্রস্ত পথিক...

কিন্তু এ অশ্ব আপনারা পেলেন কোথায়? গম্ভীর কণ্ঠে বললো হুমায়রা।

বনহুর বললো–আমরা বিপদে পড়ে এই অশ্বটির পিঠে চেপেছিলাম। অশ্বটা আমাদের এখানে এনেছে।

হুমায়রা বললো মিথ্যা কথা...

একটু হাসলো বনহুর, হেসে বললো–ও পশু না হলে প্রমাণ ও নিজেই দিতো। যাক, রাতের মত একটু আশ্রয় পেলে অত্যন্ত উপকৃত ও কৃতজ্ঞ হবো।

আপনাদের পরিচয় না জানা পর্যন্ত আমি কথা দিতে পারছি না আপনাদেরকে আশ্রয় দিতে পারবো কিনা।

পরিচয়! আমার পরিচয় পেলে আশ্রয় দেবে না জানি, তাই বিদায় মুহূর্তে আমার পরিচয় আমি দিয়ে যাবো তবে যদি আশ্রয় দাও! সঙ্গে যে তরুণীকে দেখছো সে আমার বোন।

হুমায়রা সন্দিগ্ধভাবে তাকালো তরুণীর দিকে। চোখেমুখে অবিশ্বাসের ছাপ। সে তীক্ষ্ণ নজরে তাকাচ্ছে বনহুরের সঙ্গে তরুণীটার দিকে।

বনহুর বললো–এ অশ্ব যার সে কোথায়?

কেন?

সে থাকলে আমাকে চিনতে পারবে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে জ্যোতিষী এসে দাঁড়ালো হুমায়রার পেছনে–কে কথা বলছে হুমায়রা।

ইন্দ্রনাথের অশ্ব ওদের নাকি নিয়ে এসেছে। ওরা নাকি ইন্দ্রনাথকে চেনে....

বনহুর নূতন নাম শুনলো। কে সে ইন্দ্রনাথ, তবে কি এ অশ্ব জাভেদের নয়? তরুণীর নাম হুমায়রা, এই মেয়েটি কে আর এই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীই বা কে!

জ্যোতিষী বনহুরকে ভাবতে দেখে বললো–আপনারা যেই হোন্ না কেন, ভিতরে আসুন। মা হুমায়রা, এদের বিশ্রামের জায়গা করে দাও।

হুমায়রা প্রদীপ হাতে বনহুর আর তরুণীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো।

কুটিরের পাশে ছোট্ট চালাটার মধ্যে বনহুরকে বিশ্রাম করতে দিলো আর তরুণীকে হুমায়রা নিয়ে গেলো নিজরে কুটিরে।

হুমায়রা বললো–বাবা, ওরা বড় ক্ষুধার্ত, ঘরে কিছু খাবার আছে, খেতে দেবো?

হাঁ খেতে দাও মা, খেতে দাও।

হুমায়রা খেতে দিলো।

জ্যোতিষী গিয়ে বসলো বনহুরের পাশে, যেমন করে সাধনায় বসে সন্ন্যাসী বাবাজী। বনহুর খেতে খেতে তাকালো সন্ন্যাসী বাবাজীর দিকে, বললো–বড্ড ক্ষুধার্ত ছিলাম তাই খুব উপকার হলো। চিরদিন স্মরণ থাকবে আপনার এবং মেয়েটার কথা।

মেয়েটি আমার কন্যা।

ও!

নাম ওর হুমায়রা।

আপনি যখন তার নাম ধরে ডাকছিলেন তখনই তার নাম জেনেছি। সত্যি আপনারা বড় মহৎ....বললো বনহুর। ততক্ষণে খাওয়া শেষ হয়ে এসেছিলো।

পাশের ঘরে হুমায়রা আর তরুণী কথাবার্তা বলছিলো। তরুণী বললো–বোন, তোমার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। এত ভাল তোমরা.....আচ্ছা বোন তোমরা গভীর জঙ্গলে বাস করো কেন?

আমার বাবা সন্ন্যাসী, সন্ন্যাসীরা জঙ্গলে বা গভীর বনে বাস করে, তাই আমিও বাবার সঙ্গে রয়েছি। আচ্ছা বোন, সত্যি করে বলো তো তোমরা কারা?

তরুণীর চোখ দুটো ছলছল করে উঠলো।

বললো সে–আমার জীবন অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আমি অসহায়....

যদি কষ্ট না পাও বলতে পারো বোন?

তরুণী তার জীবন কাহিনী বলে চললো।

হুমায়রা পাশে বসে সব শুনতে লাগলো।

ও ঘরে কথাবার্তা বলছে জ্যোতিষী বাবাজী আর বনহুর।

জ্যোতিষী বনহুরের মধ্যে খুঁজে পেলো ইন্দ্রনাথের প্রতিচ্ছবি।

এর কথা বলার ভঙ্গী হাসি সব যেন ইন্দ্রনাথের মত। যত রাগ হলে জ্যোতিষীর জাম্বুর ওপরে। কারণ অশ্ব জাম্বুরই ওদের বয়ে এনেছে এখানে। জ্যোতিষীর মনে একটা ক্ষুব্ধ ভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। তবে কি ইন্দ্রনাথের কেউ হবে এই লোকটা? তবে কি সে তার মহামূল্যবান মাণিকটির সন্ধান জানতে পেরেছে।

বনহুর বললো–সন্ন্যাসী বাবা, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করবো, জবাব দেবেন?

জবাব না দেবার কোনো কারণ দেখছি না।

আশ্বস্ত হলাম তবে আমার প্রশ্ন কঠিন হবে না।

কঠিন প্রশ্নের জবাবও সন্ন্যাসী দিতে প্রস্তুত।

বলুন তো, এ অশ্বটি আপনার এখানে এলো কি করে?

আপনার প্রশ্ন যত সহজ হবে ভেবেছিলাম মোটেই তা নয়।

বনহুর হেসে বললো–আমি কি তাহলে খুব শক্ত প্রশ্ন করেছি আপনাকে

কারণ এ অশ্বটির কোনো বাহক ছিলো না।

মিথ্যা কথা!

আমার কথা মিথ্যা তার প্রমাণ?

এ অশ্ব যার সে নিশ্চয়ই এখানে আছে বা ছিলো।

বিশ্বাস না করলে আমার কিছু যায় আসে না। আপনি ইচ্ছা করলে অশ্বটি গ্রহণ করতে পারেন। তা ছাড়া অশ্বটি আপনার উপকারে আসবে...

বনহুর বললো–যার এ অশ্ব তাকে আমার প্রয়োজন। বলুন সন্ন্যাসী বাবা, কোথায় সে?

বলেছি জানি না। আপনি বিশ্রাম করুন, কাল ভোরে আপনার সঙ্গে কথা হবে......সন্ন্যাসী বাবাজী দ্রুত চেলে গেলো।

হুমায়রা আর তরুণী তখন শুয়ে পড়েছিলো। খুব ক্লান্ত থাকায় নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়েছিলো তরুণীটি।

হুমায়রা কিন্তু ঘুমায়নি, সে ভাবছিলো মেয়েটির কথা.....বড় অসহায় সে, কত বিপদ গেছে। তার ওপর দিয়ে। ওকে সব সময়ের জন্য কাছে পেতো হুমায়রা বেশ ভাল লাগতো। ইন্দ্রনাথ চলে যাবার পর থেকে জীবনটা তার শূন্যতায় ভরে উঠেছে। তরুণীটিকে বেশ ভাল লাগে অল্পক্ষণে কেমন মায়া বসে গেছে যেন ওর সঙ্গে.....তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে হুমায়রা।

এমন সময় সন্ন্যাসী বাবার চাপা কণ্ঠস্বর কানে ভেসে আসে–হুমায়রা, মা আমার জেগে আছিস...

হুমায়রা ধড়মড় করে উঠে পড়লো।

কুটিরের বাইরে এসে দেখলো সন্ন্যাসী বাবা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

হুমায়রার বুকটা ধক করে উঠলো।

কারণ ইন্দ্রনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর যখন সন্ন্যাসী বাবা ফিরে এলো অদ্ভুতভাবে সঙ্গে ইন্দ্রনাথ নেই, তখন হুমায়রার বুকটা ধক করে উঠেছিলো। তার পা থেকে হুমায়রা সন্ন্যাসীকে নতুন এক রূপে দেখেছিলো। পূর্বের সে সন্ন্যাসী বাবা হারিয়ে গিয়েছিলো। সেদিন থেকে কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ ভাব জেগে রয়েছে হুমায়রার মনে।

আজ যখন হুমায়রা হঠাৎ রাতের অন্ধকারে সন্ন্যাসী বাবাজীকে দেখলো তখন ভীষণ চমকে উঠলো। কারণ সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরও স্বাভাবিক ছিলো না।

মনে তার নানা প্রশ্ন জাগছিলো।

কিছু বলবার পূর্বেই বললো সন্ন্যাসী–যারা আজ অতিথি হিসেবে আমাদের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছে তারা সাধারণ লোক নয়। কোনো গভীর উদ্দেশ্য নিয়েই তারা এসেছে। হয়তো বা আমার সেই মহামূল্যবান বস্তুটির সন্ধান এরা জানতে পেরেছে।

হুমায়রা কোনো জবাব দিতে পারলো না, কিই বা বলবে সে।

জ্যোতিষীর চোখেমুখে ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছে, বললো সে–হুমায়রা, পানির কলসীর মধ্যে নিঃ সঃ মঃ মিশিয়ে রাখো...

বাবা! ভয় ও বিস্ময়ে দুপা পিছিয়ে গেলো হুমায়রা

সন্ন্যাসী বললো–যা বললাম সেইভাবে কাজ করো। কথাটা বলে চলে গেলো সন্ন্যাসী।

হুমায়রা এসে দাঁড়ালো তরুণীর পাশে।

গভীর নিদ্রায় অচেতন তরুণী। বড় ক্লান্ত ছিলো সে তাই অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

হুমায়রা উঁকি দিলো পাশের কুটিরে, যেখানে বনহুর আর সন্ন্যাসী শয়ন করেছিলো।

হুমায়রা অবাক হলো–কক্ষ শূন্য, কেউ নেই। সন্ন্যাসী শয্যা ত্যাগ করে বেরিয়ে এসেছে কিন্তু লোকটা গেলো কোথায়। হঠাৎ চমকে উঠলো হুমায়রা, কেউ যেন তার কাঁধে হাত রাখলো। ফিরে তাকাতেই দেখখো সেই ব্যক্তি যাকে তারা আশ্রয় দিয়েছে সে তার পেছনে দাঁড়িয়ে।

বললে হুমায়রা–আপনি!

হাঁ আমি। হুমায়রা, আমি আড়াল থেকে সব শুনেছি। বিষাক্ত কোনো ওষুধ পানিতে মিশিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে সন্ন্যাসী! দিতে পারো...

অবাক হয়ে তাকায় হুমায়রা বনহুরের দিকে।

বনহুর বলে–আমাদের কোনো ক্ষতি হোক তুমি তা চাওনা। বেশ, তাই হবে, আমরা রাতের অন্ধকারেই চলে যাবো।

কিন্তু আপনি জানেন না সন্ন্যাসী বাবা আপনাদের কিছুতেই যেতে দেবেন না....

আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলো হুমায়রা কিন্তু বলা হলো না। একটা পদশব্দ তাদের কানে ভেসে এলো। বনহুর বললো–মুহূর্ত দেরি করো না, চলে যাও। আমি আমার শয্যায় ফিরে যাচ্ছি।

বনহুর চলে গেলো।

হুমায়রা চলে গেলো নিজের কুটিরে।

বনহুর কুটিরে প্রবেশ করতেই আধো অন্ধকারে দেখলো একটি ছায়ামূর্তি কুটিরের বারান্দায় উঠে এলো!

দ্রুত খেজুর পাতার চাটাইটার ওপরে শয়ন করলো বনহুর, তারপর নিদ্রার ভান করে দেখতে লাগলো সবকিছু।

সন্ন্যাসী কুটিরে প্রবেশ করে ওপাশে শয়ন করলো। বনহুর সব লক্ষ্য করে। এবার সে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমালো কারণ বাকি রাতটুকু সন্ন্যাসী বাবাও শয্যা তাগ করবে না বলেই তার ধারণা।

বনহুর ভাবছে, রাত ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোনো অসুবিধা দেখা দিতে পারে, কাজেই ভোরের পূর্বেই সরে পড়া ভালো তাহলে পানি পান করার কোনো প্রয়োজন হবে না। বিশেষ করে তার সঙ্গিনীটির জন্য এত ভাবনা। অবশ্য জাভেদের সন্ধান সে এখানে পাবে তাতে কোনো ভুল নেই, কারণ জাভেদের অশ্বটাকে সে এখানে পেয়েছে। বিপদগ্রস্ত মেয়েটাকে যতক্ষণ না সে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিতে পেরেছে ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত নয়....

*

হুমায়রা, হুমায়রা.... ব্যস্ত কণ্ঠে ডাকলো সন্ন্যাসী নিদ্রামগ্ন হুমায়রাকে।

হুমায়রা গভীরভাবে ঘুমাচ্ছিলো, কারণ অনেক রাতে তারা শয়ন করেছিলো, নাইলে–ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গে জেগে উঠতো হুমায়রা। হঠাৎ সন্ন্যাসী বাবার ব্যস্ত কণ্ঠের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলো ওর। তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করে সন্ন্যাসী বাবার সামনে এসে দাঁড়ালো–বাবা, ডাকছো?

হাঁ শোন মা,সর্বনাশ হয়ে গেছে!

সর্বনাশ!

অতিথিরা ভেগেছে...

তার মানে?

মানে ওরা ভোর হবার আগেই সরে পড়েছে।

তাতে সর্বনাশের কি হলো বাবা?

সর্বনাশ মানে ঘোড়াটিকে নিয়ে পালিয়েছে।

ও আর এমন কি বাবা। একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে হুমায়রা, তারপর বলে–যার অশ্ব সেই হারিয়ে গেছে, কাজেই আমাদের অশ্ব থাকলেই বা কি আর না থাকলেই

বা কি!

অবশ্য ঠিক বলেছিস মা। ওটা আমাদের কোনো উপকারেই আসলে না, গেছে আপদ গেছে। তবে ওরা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছিলো বলে আমার মনে হয়।

হুমায়রা বললো–তা যে উদ্দেশ্য নিয়েই আসুক আমাদের কোনো ক্ষতি তারা করেনি…

হাঁ, তারা ক্ষতি করেনি তবে করতো। আমার মহামূল্যবান সম্পদটির সন্ধান যদি ওরা পেতো….

বাবা, ওরা তোমার কোন সম্পদ নিতে আসেনি। বেচারারা এসেছিলো রাতের মত একটু আশ্রয়ের জন্য।

যাক চলে গেছে রক্ষা পেয়েছি। কিন্তু লোকটাকে আমার বড় সন্দেহ হচ্ছিলো।

কেন? বললো হুমায়রা।

বললো সন্ন্যাসী বাবাজী–মা হুমায়রা, তুমি কমবয়সী মেয়ে। সব দিক তোমার খেয়াল নেই। তুমি যদি ভাল করে লক্ষ্য করতে তাহলে দেখতে লোকটার চেহারার সঙ্গে ইন্দ্রনাথের মিল আছে….

তাতে আমাদের বিচলিত হবার কি আছে? সে তো চলে গেছে, আর কোনোদিন ফিরে আসবে কিনা তাও তুমিই জানো বাবা, কারণ ইন্দ্রনাথ তোমার সঙ্গে গিয়েছিলো।

হাঁ গিয়েছিলো, তারপর যে কোথায় আত্মগোপন করেছে তা আমি জানি না।

কিন্তু সে তো তেমন ছেলে নয়।

যাক ওর কথা বলে কোনো ফল হবে না…

আমি তো ওর কথা তুলিনি বাবা, তুমিই বলছিলে।

বলবো না কেন, সত্যিই এ লোকটার সঙ্গে ওর সবকিছুর মিল আমি লক্ষ্য করেছি। কথা বলার ভাবভঙ্গিতেও ইন্দ্রনাথের সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে, কাজেই….

বাপু আজকাল এত সন্দিহান হয়ে উঠেছে তোমার মন। আগে তো অমন ছিলেনা? ওরা চলে গেছে তাতে আমার কিছু যায় আসে না।

চলেই শুধু যায়নি, ইন্দ্রনাথের অশ্ব নিয়ে উধাও হয়েছে। নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য আছে।

কথাগুলো বলে সন্ন্যাসী তার নিজের কুটিরে প্রবেশ করলো।

হুমায়রা ভাবছে তার বাবা কেমন যেন হৃদয়হীন হয়ে পড়েছে আজকাল।

*

দস্যুরাণীর দুচোখে আগুন ঝরে পড়ছে।

যে অমূল্য সম্পদ পাবার জন্য দস্যুরাণী বনহুরের সাহায্য কামনা করেছিলো সেই সম্পদ তার হারিয়ে গেলো। সন্ন্যাসী আর সেই তরুণ–এরা দুজন মিলে কৌশলে তার গোপন স্থান থেকে উদ্ধারও করলো সম্পদটি।

এটা বড় দুঃখ আর সেই দুঃখ পরিণত হলো প্রতিহিংসায়। সমস্ত ভূগর্ভ আস্তানা তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও পেলো না রাণী সন্ন্যাসী আর তরুণটিকে।

বন্দীশালার তলদেশে কোনো গর্ত বা ছিদ্রপথও খুঁজে পেলো না। তবে গেলো কোন পথে?

বন্দীশালার প্রহরীকে বন্দী করা হলো। তাকে কঠিন শাস্তি দেওয়ার জন্য নির্দেশ দিলো দস্যুরাণী। কিন্তু প্রহরীর কোন দোষ ছিলো না, সে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই পাহারা দিচ্ছিলো।

কোথায় গেলে বন্দী দুজন?

সমস্ত ভূগর্ভ আস্তানা খুঁজে যখন কোথাও সন্ন্যাসী ও তরুণটাকে পাওয়া গেলো না তখন দস্যুরাণী উন্মাদিনীর মত নিজের অধর দংশন করতে লাগলো।

ক্ষিপ্তের মত পায়চারী করছে দস্যুরাণী।

তার ভারী বুটের শব্দ প্রতিধ্বনি তুলছে ভূগর্ভ আস্তানার দেয়ালে দেয়ালে।

রহমত থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শুধু রহমত নয়, আরও অন্যান্য অনুচর যারা দস্যুরাণীর দুপাশে দণ্ডায়মান, তাদের চোখেমুখেও একটা ভীষণ ভয়ার্ত ভাব বিরাজ করছে।

দস্যুরাণী হঠাৎ পায়চারী বন্ধ করে বলে উঠলো–আমি ভাবতেও পারিনি এমন হবে। বন্দী দুটিকে আমার গ্রাহ্যই হয়নি, অথচ তারা এত চতুর....

রহমত বললো–রাণীজী, ওদের জীবিত না রেখে হত্যা করাটাই সমীচীন ছিলো।

হাঁ, ওদের জীবিত রাখা ঠিক হয়নি এখন বেশ বুঝতে পারছি। যে সম্পদটি সরিয়ে রাখার জন্য আমি জম্ভু পর্বত ত্যাগ করে অজানা এক দ্বীপে এসে আস্তানা স্থাপন করলাম, তবু রাখতে পারলাম না। এমনভাবে পরাজিত হবে তা ভাবতে পারিনি রহমত।

রাণীজী, ওরা দুজন কি করে পালালো এটা আমি নিজেও অনুধাবন করতে পারছি না।

আমার মনে হয় ওরা আমার আস্তানার কোথাও আত্মগোপন করে আছে।

না রাণীজী, তারা.....

রহমতের কথা শেষ হয় না, একজন অনুচর হন্তদন্ত হয়ে এসে খবর দেয়–রাণীজী, রাণীজী, পাওয়া গেছে....পাওয়া গেছে..

রাণী বলে উঠলো–পাওয়া গেছে। কি পাওয়া গেছে?

সেই তরুণটিকে পাওয়া গেছে।

সন্ন্যাসী–সন্ন্যাসীটিকে কোথাও খুঁজে পেলাম না। শুধু তরুণটি ভূগর্ভের তলদেশের সুড়ঙ্গে অজ্ঞান অবস্থায় পড়েছিলো।

সেই মহামূল্য সম্পদটি কি তার নিকটে পাওয়া গেছে?

না, পাওয়া যায়নি।

তাহলে সন্ন্যাসী তার কাজ সমাধা করে উধাও হয়েছে।

হাঁ রাণীজী।

তার সঙ্গীটিকে রেখে গেলো কেন এবার বুঝতে পেরেছি। সম্পদটি নিয়ে সন্ন্যাসী ভেগেছে……রাণীর কথা শেষ হয় না, দুহাত পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় সেই তরুণটিকে নিয়ে হাজির হয় কয়েকজন অনুচর।

দস্যুরাণী ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাকায় তরুণটির মুখের দিকে। দুচোখ দিয়ে যেন তার আগুন ঠিকরে বের হচ্ছিলো। বললো সে–ওঃ বড় চতুর দেখছি। বলো মাণিকটি কোথায় রেখেছে আর তোমার সঙ্গী সন্ন্যাসী কোথায়?

দৃষ্টি তুলে ধরলো তরুণ দস্যুরাণীর মুখের দিকে। মুখ থেকে পা পর্যন্ত তীক্ষ্ণনজরে দেখলো সে রাণীকে। কোনো জবাব দিলো না।

বললো দস্যুরাণী–কি দেখছো যুবক?

তবু নিরব সে।

আবার বলল দস্যুরাণী–আমার কথার জবাব দাও। বললো, তোমার সঙ্গী কোথায় এবং মাণিকটি কোথায়?

এবার বললো তরুণ–আমি জানি না।

জানোনা? দাঁতে দাঁত পিষে বললো দস্যুরাণী। একটু থেমে পুনরায় বললো–বন্দীশালা থেকে কিভাবে বেরুলে বলো? জবাব দাও কিভাবে বের হয়েছে?

দস্যুরাণী কথাটা শেষ করে একটা চাবুক টেনে নিলো দেয়াল থেকে, তারপর সপাং করে এক ঘা বসিয়ে দিলো তরুণের পিঠে।

তরুণের পরিচয় না নিলেও পাঠকগণ ঠিকই বুঝতে পেরেছেন সে জাভেদ। দস্যুরাণীর চাবুকের আঘাতে জাভেদ বা ইন্দ্রনাথ যন্ত্রণায় মুখখানা বিকৃত করলো, কারণ কদিন তাকে ভীষণ কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। সন্ন্যাসী তার হাত থেকে সেই মহামূল্যবান সম্পদটি নেবার পর তাকে গভীর খাদ বা জলাশয়ের মধ্যে পাথর

চাপা দিয়েছিলো। সে যদি ভাল ডুবসাঁতার না জানতে তাহলে মৃত্যু তার অনিবার্য ছিলো।

সন্ন্যাসী জলাশয়ের মুখে পাথর চাপা দেবার সঙ্গে সঙ্গে জাভেদ বুঝতে পারে তাকে হত্যা করার জন্য সন্ন্যাসী এই পাথর চাপা দিয়েছে, এ মুহূর্তে নিজকে রক্ষা করার জন্য তাকে চেষ্টা করতে হবে। জাভেদ ডুবসাঁতার কেটে পথের সন্ধান করে এগুলো। তার দৃষ্টিশক্তি ছিলো অত্যন্ত প্রখর। কাজেই কোনো অসুবিধা হলো না সাঁতার কেটে এগুতে।

স্পষ্ট সে দেখতে পাচ্ছে জলাশয়ের তলদেশের এক পাশে আলোর উজ্জ্বলতা। জাভেদ সেই। দিকে ডুবসাঁতার কেটে এগিয়ে চললো।

তাকে বেশিক্ষণ সাঁতার কাটতে হলো না। পায়ের নিচে মাটি স্পর্শ করলো এবং সে মাথা তুলে দেখলো আবছা অন্ধকার একটা জায়গা। জাভেদ বিলম্ব না করে উঠে পড়লো কিন্তু এত বেশি সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো যে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললো সে এ মুহূর্তে।

এদিকে তখন ভীষণভাবে তল্লাসী শুরু হয়ে গেছে। সন্ন্যাসী আর তরুণ গেলো কোথায়। ভূগর্ভের জলাশয়ের পথে তারা ভূগর্ভ আস্তানা থেকে বেরিয়ে যাবে, এ কথা ভাবতেও পারেনি দস্যুরাণী বা তার অনুচরগণ।

সন্ধান করতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ে যায় তরুণটি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছে সুড়ঙ্গপথের মেঝেতে।

অনুচরগণ তাকে ঐ অবস্থায় বন্দী করে এবং নিয়ে গিয়ে এক নির্জন কক্ষে আটক করে। যখন তার জ্ঞান ফিরে এলো তখন তাকে নিয়ে হাজির হলো দস্যুরাণীর সামনে।

দস্যুরাণীর দুচোখ বিস্ময় রাগ দুঃখ, তার মহামূল্যবান সম্পদ হরণ করেছে ওরা।

ওরা কারা যারা তার এত সাধনার ধন নিয়ে গেলো! যত রাগ এসে পড়লো তরুণটির ওপর।

দস্যুরাণীর চাবুকের আঘাতে জাভেদ মুখখানা বিকৃত করলো।

দস্যুরাণী পুনরায় আঘাত করলে তার দেহে। সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলো–বলল, কোন্ পথে ভেগেছিলে? জবাব দাও....

জাভেদ বললো–কারাকক্ষের দেয়ালে একটা গুপ্ত দরজা আছে সেই পথে...

বলো কি?

হ্যাঁ।

দস্যুরাণী তাকালো রহমতের মুখের দিকে।

রহমত নিজেও বিস্ময়ে থ হয়ে গেছে।

অন্যান্য অনুচর রীতিমত হতভম্ব স্তম্ভিত, কারণ কেউ তারা জানে না সেই বদ্ধ কারাকক্ষের দেয়ালে কোনো গুপ্ত দরজা বা সুড়ঙ্গ পথ আছে।

দস্যুরাণী বললো–যাও রহমত, এক্ষুণি দেখে এসো এই তরুণের কথা সত্য কিনা?

রহমত কুর্ণিশ জানিয়ে চলে গেলো।

দস্যুরাণী অনুচরদের দিকে তাকিয়ে বললো–তোমরা একে নিয়ে গিয়ে পুনরায় বন্দী করে রাখো। আমি তার বন্দীশালায় গিয়ে কিছু প্রশ্ন করবো। ঠিক জবাব পেলে ওকে মুক্ত করে দেবো আর যদি ঠিক জবাব না দেয় তাহলে মৃত্যুদণ্ডই হবে ওর শাস্তি।

অনুচরগণ জাভেদকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে নিয়ে গেলো বন্দীশালায়, তবে ঐ বন্দীশালায় নয়, অপর এক অন্ধকার গুহায় তাকে বন্দী করে রাখা হলো।

ততক্ষণে ফিরে এলো রহমত, কুর্ণিশ জানিয়ে সম্মানের সঙ্গে বললো–রাণীজী, তাজ্জবের ব্যাপার, বন্দীশালার কোথাও দরজা বা সুড়ঙ্গপথ খুঁজে পেলাম না।

তার মানে? তবে কি সে মিথ্যা কথা বললো?

রাণীজী, তাই হবে। বহু সন্ধান করেও কোনো দরজা খুঁজে পেলাম না।

চলো আমি নিজে দেখবো!

রহমত আর রাণী চললো সেই ভূগর্ভ বন্দীশালায়। অনেক করে সন্ধান চালালো কিন্তু কোথাও কোনো পথের সন্ধান পেলো না।

বিস্ময়ে থহলো রাণী। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কোনো পথের সন্ধান পেলো না।

হতাশ হয়ে পড়লো দস্যুরাণী।

রহমত এবং আরও কয়েকজন অনুচর সবাই মিলে হিমসিম খেয়ে গেলো।

বললো রাণী–যাও রহমত ঐ তরুণকে নিয়ে এসো, কোন্ পথে সে এই দরজা জানালাবিহীন কক্ষ থেকে বের হলো? হয় তারা যাদু জানতো না হলে কৌশলে আসল দরজা দিয়েই বের হয়েছে।

রহমত চলে গেলো। তাকে অনুসরণ করলে আরও দুজন অনুচর।

রাণী বন্দীশালার মেঝেতে পায়চারী করতে লাগলো। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলো। কিভাবে সন্ন্যাসী এবং তরুণ বন্দীশালা থেকে বের হলো। হরণ করলো গুপ্ত গুহা থেকে সেই মহামূল্যবান সম্পদটি। যতই ভাবছে দস্যুরাণী ততই বিস্ময়ে ভরে উঠছে তার মন।

এমন সময় রহমত বন্দী তরুণসহ ফিরে এলো। রহমতের সঙ্গীদ্বয় তরুণকে পিছমোড়া করে বেঁধে এনেছিলো।

তরুণের বলিষ্ঠ সুন্দর দেহে দস্যুরাণীর চাবুকের আঘাত কেটে বসে গিয়েছিলো।

এ মুহূর্তে দস্যুরাণীর কেমন যেন মায়া হলো। এ মুখখানা তার পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু তা কি সম্ভব যা ভাবছে দস্যুরাণী! যতই সে মনকে ভুল পথ থেকে ফেরাতে চায় ততই যেন আরও বেশি করে মনে হয় এ মুখ যেন তারই প্রতিচ্ছবি–সেই মুখের প্রতিবিম্ব,...

রহমত বললো–রাণীজী, একে এনেছি।

হাঁ! আচ্ছা যুবক, বলো তুমি কোন্ পথে এই দুর্গম গুহাকক্ষ হতে বের হলে?

জাভেদ বললো–আপনার পাশে যে উঁচু পাথরটা দেয়ালে গাঁথা রয়েছে ঐটাই সেই পথ.....

দস্যুরাণী অবাক দৃষ্টি মেলে তাকালো সেই দেয়ালটার দিকে। উঁচু একটা পাথরের চাপ ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছে না। দস্যুরাণী হাত দিয়ে ঠেলা দিলো কিন্তু একচুলও নড়াতে পারলো না। ভারী ভুট দিয়ে পদাঘাত করলে তবু একটুও নড়লো না পাথরখানা।

দস্যুরাণী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললো–মিথ্যা বলার শাস্তি কি জানো যুবক?

জাভেদ কোনো কথা বললো না।

দস্যুরাণী বললো–তুমি এ পাথর সরিয়ে ফেলল, আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখতে চাই। তোমার কথা সত্য কিনা। রহমত, খুলে দাও ওর হাতের বাঁধন।

রহমত দস্যুরাণীর নির্দেশমত জাভেদের হাতের বাঁধন মুক্ত করে দিলো।

দস্যুরাণী পিস্তল উদ্যত করে বললো–যদি তুমি মিথ্যা কথা বলে থাকো তাহলে এই পিস্তল তোমাকে রেহাই দেবে না।

তরুণ একটু হাসলো মাত্র।

তারপর সে দেয়ালের পাশে গিয়ে উঁচু পাথরখানা অনায়াসে সরিয়ে ফেললো। দেখা গেলো একটি সুড়ঙ্গপথ সোজাসুজি চলে গেছে পাথরের দেয়ালের ভিতর দিয়ে অনেক দূরে।

এবার দস্যুরাণীর দুচোখ বিস্ময়ে ভরে উঠলো। তরুণ অসাধারণ, এত শক্তি তার দেহে, এ যেন অবিশ্বাস্য ব্যাপার। রাণীর চোখের সম্মুখে ভাসছে আর একটা মুখ–সে হলো দস্যু বনহুর।

দস্যুরাণী রহমতের কানে মুখ নিয়ে বললো–জানো এ তরুণ কে?

তা আমি জানবো কি করে রাণীজী?

এ তরুণের সঙ্গে নিশ্চয়ই দস্যু বনহুরের রক্তের কোনো সংশ্রব আছে বলে আমার মনে হয়।

ঠিক বলেছেন রাণীজী, সেরকমই মনে হচ্ছে।

যাও ওকে বিশ্রামকক্ষে নিয়ে যাও।

রহমত বললো–আচ্ছা রাণীজী।

দস্যুরাণী বললো–ওরা নিয়ে যাক! তোমার সঙ্গে কথা আছে।

কথা আছে....

হাঁ!

রহমত সঙ্গীদ্বয়কে বললো–নিয়ে যাও, ওকে বিশ্রাম গুহায় নিয়ে যাও।

হাত দুখানা দস্যুরাণীর ইংগিতে পুনরায় মজবুত করে বেঁধে দেওয়া হলো।

ওরা নিয়ে গেলো বন্দী তরুণটাকে।

দস্যুরাণী বললো–রহমত এ তরুণ সাধারণ নয়–অসাধারণ।

হাঁ রাণীজী, তাই মনে হচ্ছে।

মনে হচ্ছে নয়, একেবারে সত্য! একটু থেমে বললো, দস্যুরাণী ওকে পেলে আমাদের অনেক কাজ সহজ হবে।

ও কি আমাদের বশে আসবে।

চেষ্টা করতে হবে। তবে তার পূর্বে আরও অনেক কাজ আছে। মাণিকটা সন্ন্যাসী নিয়ে ভেগেছে, যেমন করে হোক ওটা উদ্ধার করতেই হবে।

রহমত মাথা চুলকে বললো–তরুণটির দ্বারাই কাজ উদ্ধার করতে হবে। রাণীজী, আমরা চেষ্টা করে দেখি তার কাছে সব জবাব পাওয়া যায় কিনা।

বেশ তাই করো, যেমন করে পায়রা ওর কাছে সব জেনে নাও। ওকে আমাদের প্রয়োজন আছে...।

আচ্ছা রাণীজী!

শোন রহমত, ওর কাছে জেনে নিও সন্ন্যাসীর আসল পরিচয়। মহামূল্যবান সম্পদটি সন্ন্যাসীর নিকটেই আছে বলে আমার ধারণা।

হ রাণীজী, এ কথা সত্য!

যাও, ঠিকমত কাজ করবে।

রহমত চলে যাবার পর দস্যুরাণী অনুচরদের অগোচরে হাজির হলো যেখানে জাভেদকে বন্দী করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

অনুচরগণ জাভেদকে একটি গুহায় নিয়ে গিয়ে তার হাত দুখানার বাঁধন মুক্ত করে দিয়ে কিছু খাবার রাখলো তার সামনে।

জাভেদ খাবারগুলোর দিকে তাকালো।

অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ছিলো জাভেদ তাই সে বিনা দ্বিধায় খাবারগুলো খেতে শুরু করলো।

খাওয়া শেষ হলে প্রশ্ন করলো একজন অনুচর–যুবক, বলো সেই মূল্যবান সামগ্রীটা কি

অপর একজন বলে উঠলো–হাঁ, তুমি যদি সঠিক জবাব দাও তাহলে তোমাকে আমরা মুক্ত করে দেবো।

চোখ দুটো তুলে ধরলো জাভেদ অনুচরটির মুখের দিকে। তারপর হাতের পিঠে মুখটা মুছে নিয়ে বললো–সত্যি আমাকে তোমরা মুক্ত করে দেবে যদি আমি সঠিক জবাব দেই?

হাঁ দেবো বলো? কথাটা বলে রহমত জাভেদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

দস্যুরাণী সবার অলক্ষ্যে এসে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো।

জাভেদ বললো–সব জানার পর তোমরা যদি আমাকে মুক্ত করে না দাও তাহলে আমার কাছে রেহাই পাবে না।

রহমত কিছু বলবার পূর্বেই বললো প্রথম অনুচরটি–সত্যিই তুমি যদি সব কথা বলো তাহলে আমরা তোমাকে মুক্তি দেবো...

জাভেদ বললো–বেশ বলছি। যে মূল্যবান সম্পদটি আমি উদ্ধার করেছিলাম তা আমার সঙ্গে যে সন্ন্যাসী ছিলো তার নিকটে। বস্তুটি সে হস্তগত করার পর আমাকে হত্যা করার জন্য জলাশয়ে বন্দী করে দিয়েছিলো, তারপর আমি কিছু জানি না। এই হলো আমার সত্য কথা। দাও আমাকে এবার মুক্ত করে দাও।

রহমত বললো–বেশ রাণীজীর মতামত নিয়ে আমরা তোমাকে মুক্ত করে দেবো।

তবে কেন বললে, সত্যি কথা বললে তোমরা আমাকে মুক্ত করে দেবে? কথা শেষ না করেই জাভেদ অনুচরটির জামার আস্তিন চেপে ধরলো, তারপর প্রচণ্ড এক ঘুষি বসিয়ে দিলো তার নাকের ওপর।

সঙ্গে সঙ্গে রক্ত গড়িয়ে পড়লে তার নাক দিয়ে।

অনুচরটি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে পাল্টা আক্রমণ করে বসলো জাভেদকে।

কিন্তু আক্রমণ করবার পূর্বেই দস্যুরাণী প্রবেশ করে বলে উঠলো–থামো! খবরদার, ওর গায়ে হাত তুলো না। ওকে আমার প্রয়োজন আছে....।

আচমকা দস্যুরাণীকে দেখে অনুচরটি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

অপর এক অনুচর বললো–রাণীজী, একে ক্ষমা করা যায় না। যুবকটির স্পর্ধা কম নয়, সে আমাদের বিশ্বস্ত অনুচর আলফানের চোয়ালে প্রচণ্ড আঘাত করেছে।

হাঁ দেখতে পাচ্ছি। বিচার হবে দরবারকক্ষে। তোমরা ওকে দরবারকক্ষে হাজির করো। কথাটা বলে রাণীজী চলে গেলো। যাবার সময় ইংগিতে কিছু বললো রহমতকে।

রহমত অনুচরদের লক্ষ্য করে বললো–ওকে নিয়ে চলো।

রহমত এবং আরও দুজন অনুচর মিলে জাভেদকে নিয়ে হাজির করলো রাণীজীর নতুন দরবারকক্ষে।

সুউচ্চ আসনে উপবিষ্ট দস্যুরাণী।

জাভেদকে বন্দী অবস্থায় নিয়ে এলেও তার হাত-পা মুক্ত ছিলো। রাণীর নির্দেশমত তাকে মুক্ত রাখা হয়েছে।

জাভেদের দুপাশে দুজন অনুচর তাকে ধরে রেখেছিলো।

রাণীর সামনে পৌঁছতেই ঝটকা দিয়ে জাভেদ নিজকে মুক্ত করে নিলো ওদের হাত থেকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকালো সে রাণীর দিকে।

দস্যুরাণী গম্ভীর কণ্ঠে বললো–তুমি আমার অনুচরটিকে এভাবে মারলে কেন?

জাভেদ নির্ভয়ে দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো–আমাকে কথা দিয়ে তা রক্ষা করেনি, তাই আমি তাদের মিথ্যা কথা বলার জন্য শাস্তি দিয়েছি।

জাভেদের বলিষ্ঠ নির্ভীক কণ্ঠস্বরে ভীষণ খুশি হয় দস্যুরাণী কিন্তু মনোভাব প্রকাশ না করে। বলে–জানো এই অপরাধে তোমার মৃত্যুদণ্ড হলে আমি দুঃখ পাব কিন্তু ভীত হবে না।

যুবক, তোমার কথাটা পরিষ্কার হলো না?

কারণ আমি জানি আমার মৃত্যু হলে তোমরা মাণিক আর পাবে না।

তাহলে তুমি আমার মাণিক উদ্ধার করে দিতে রাজি আছো?

যেহেতু সন্ন্যাসী আমার ওপর অবিচার করেছে। আমাকে সে হত্যা করার জন্য চেষ্টা করেছে। তার কাছে আমি মরে গেছি…

যুবক!

হাঁ, আমি তার কাছ থেকে তোমার অমূল্য সম্পদ উদ্ধার করে এনে দেবো।

সত্যি পারবে?

পারবো।

যুবক, তোমার কথা শুনে আমি অনেক খুশি হলাম।

বেশ, তাহলে আমাকে মুক্ত করে দাও।

কিন্তু তুমি আবার ফিরে আসবে এটা আমি কি করে বুঝবো?

এ বিশ্বাস তোমার থাকা দরকার! আমি তোমার অনুচরদের মত মিথ্যাবাদী নই।

তোমাকে মুক্ত করে দেবো কিন্তু তুমি যদি তোমার শপথ ভুলে যাও তাহলে তোমাকে নির্মমভাবে হত্যা করা হবে।

হত্যার ভয়ে ভীত আমি নই, তবে কথা যা দেই, তা রক্ষা করার জন্য আমি মৃত্যুবরণ করতে দ্বিধাবোধ করি না।

তোমার কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট তাই আমার জানার জন্য বড় ইচ্ছা কে তুমি? তোমার পরিচয় কি?

এবার জাভেদ আনমনা হয়ে গেলো। উদাস মনে তাকালো সে গুহার দেয়ালে জ্বলন্ত মশালটার দিকে।

মশালের দীপ্ত আলোতে জাভেদকে দীপ্ত বলিষ্ঠ পুরুষ বলে মনে হচ্ছিলো। তার চোখ দুটো গভীর ভাবময় উদাস লাগছে। রাণীর কথায় চট করে জবাব দিতে পারলো না জাভেদ। কারণ সে নিজের পরিচয় নিজেই জানে না। সন্ন্যাসীর ওষুধ তার সমস্ত সত্তাকে বিলীন করে দিয়েছে। ভুলে গেছে সে কি তার পরিচয়।

জাভেদ আজ ইন্দ্রনাথ নামে পরিচিত।

সন্ন্যাসী তার কে তাও সে জানে না।

জানে না হুমায়রার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ। তবে তরুণীটি তাকে ভাল নজরে দেখে তা সে বোঝে। সন্ন্যাসীকে জাভেদ বিশ্বাস করতো, সে বিশ্বাস হারিয়ে গেছে আজ, কারণ সন্ন্যাসী তাকে হত্যা করতে চেয়েছে। সন্ন্যাসীর যদি এতটুকু মায়া

থাকতত তার ওপর, তাহলে সে তাকে জলাশয়ে আটক করে হত্যা করতো না। সন্ন্যাসীর কাছে সে মরে গেছে……

দস্যুরাণী জাভেদকে ভাবতে দেখে বললো–যুবক, কি ভাবছো? আমার প্রশ্নের জবাব দাও।

জাভেদ চোখ দুটো তুলে ধরলো দস্যুরাণীর মুখের দিকে। বললো সে–জানি না। জানি না আমি কে।

দস্যুরাণী অবাক হয়ে বললো–জানো না তুমি কে? কি তোমার পরিচয়।

না জানি না।

সন্ন্যাসী তোমার কে?

জানি না।

জানো না!

না।

তবে তার সঙ্গে তোমার কিসের সম্পর্ক

তাও জানি না।

তাহলে তার সঙ্গে তুমি কেন এসেছ?

সে কথাও জানি না।

তোমার জীবন দেখছি বিস্ময়কর।

হাঁ

মাণিক নিতে হবে কেন এসেছিলে?

সন্ন্যাসীর নির্দেশমত আমি কাজ করেছিলাম।

জাভেদের কথাগুলো শুনে দস্যুরাণী কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়লো। জাভেদের কাহিনী শুধু বিস্ময়কর নয়, একেবারে আশ্চর্যজনক!

দস্যুরাণী কি ভেবে বললো–থাক, তোমার কোনো জবাব আমি চাই না। ইংগিত করলো রাণী তার অনুচরদের দিকে। ..

অনুচর দুজন নিয়ে গেলো জাভেদকে।

দস্যুরাণী এবার রহমতকে বললো–রহমত, এই তরুণের জীবন কাহিনী আশ্চর্যজনক মনে হচ্ছে!

হাঁ রাণীজী! তরুণের কথাবার্তায় সেরকমই মনে হচ্ছে।

আমি চাই তাকে দিয়েই আমার মহামূল্য মানিকটা উদ্ধার করে আনতে। ওকে বন্দীশালায় বন্দী করে না রেখে তোমরা চোখে চোখে রাখো। আয়োজন করো, আমি অচিরে জম্বুর পর্বতে ফিরে যেতে চাই

বেশ, তাই হবে রাণীজী।

রহমত কথাটা বলে কুর্ণিশ জানালো।

*

তরুণীর বাবা কন্যাকে ফিরে পেয়ে খুশির আবেগে কেঁদে ফেললেন। তিনি প্রথমে কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, তারপর বনহুরের হাত দুখানা চেপে ধরলেন–কে আপনি? এত মহৎ আপনি….

বললো তরুণী–বাবা, উনি যদি ঠিক সময়ে এসে না পড়তেন তাহলে আমাকে তুমি কোনোদিন ফিরে পেতে না। ওর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

তরুণীর বাবা তাকিয়ে আছে অবাক বিস্ময়ে বনহুরের দিকে। একজন শ্রমিক ছাড়া তাকে কিছু মনে করা যায় না। তরুণীর বাবা আরও অবাক হলেন লোকটা শ্রমিক হলেও তার চেহারার মধ্যে রয়েছে একটা পৌরুষদীপ্ত আভিজাত্যের ছাপ। পা থেকে মাথা পর্যন্ত তিনি দেখছিলেন তাকিয়ে তাকিয়ে।

বনহুর বুঝতে পারে তাকে দেখে তরুণীর বাবা বিস্মিত হয়েছেন, ভাবছেন একটা শ্রমিকের মধ্যে রয়েছে এত মহত্ত্ব।

তরুণী সংক্ষেপে ঘটনাটা সব বলে নিলো। তারপর বললো–ওর মহান হৃদয়ের কাছে পরাজিত তারা যারা মহৎ ব্যক্তি সেজে জনগণের সর্বনাশ করে যাচ্ছেন। বাবা তুমি জানো না যারা আজ সরকারের সুউচ্চ দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত, জনগণের দায়িত্বভার গ্রহণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে যারা গদি নিয়েছেন তারা কত অসৎ....

জানি মা সব জানি।

না। যদি জানতে তাহলে তুমি মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে আমাকে বিনাদ্বিধায় পাঠাতে না। ওরা মুখোশধারী সাধু। ওদের বিশ্বাস করতে নেই বাবা।

মা!

হাঁ বাবা, তোমাদের বয়স হয়েছে, তোমাদের এখন মানুষ চিনতে ভুল করা মোটেই উচিত নয় যখন এই নরপশুরা গদির লোভে ভিজা বিড়ালের মত জনগণের দ্বারে দ্বারে যান ভোট ভিক্ষার জন্য তখন তোমরা ভুলে যাও তাদের আসল রূপ। তাদের ওপরের সাধুতার মুখোশ তোমাদের মনকে বিমুগ্ধ করে। তখন তোমরা নেতা নির্বাচনে চরম ভুল করো। যাদের অর্থ আছে, অট্টালিকা আছে, আছে গাড়ি–বাড়ি শান–শওকত, তারা এসেছে তোমাদের কাছে....তখন তোমরা নিজেদের মনে করো সৌভাগ্যবান; তোমাদের যে মহান নেতা হবার যোগ্যব্যক্তি তিনি সশরীরে হাজির হয়েছেন গরীবালয়ে। গদ গদ কণ্ঠস্বরে ভুলে যাও তোমরা নিজেদের অস্তিত্ব। মহারথীরা তখন সাধুতার চরম শিখরে ওঠে যান–তারা তখন তোমাদের ছেঁড়া মাদুরটায় কিংবা হাতলভাঙা চেয়ারটায় বসে নিজেদের বিনয় জাহির করেন। তোমরা মনে করে এত ভাল লোক আর হয় না।

বনহুর বিস্ময়ে হতবাক হয়ে শুনে যাচ্ছে তরুণীর কথাগুলো। চোখ দুটো তার দীপ্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সাধারণ একটা তরুণীর মধ্যেও জেগেছে প্রাণ। তারাও চিনতে শিখেছে মানুষের আসল রূপ। ওঃ! কি অনাবিল শান্তিই না পাচ্ছে বনহুর নিজের মনে।

তরুণী বলেই চলেছে–বাবা, আমরা সাধারণ মানুষ। আমাদের নেই ঐশ্বর্যের ইমারত। আমাদের নেই ব্যাংক–ব্যালেন্স। আমাদের নেই গাড়ি–বাড়ি শান–শওকত। কাজেই আমরা এমন লোককে বেছে নেবো যারা আমাদের দুঃখ ব্যথা বেদনা বুঝবে। যাদের ধরাছোঁয়া পাবো আমরা। জানো বাবা যে মহারথীরা একদিন আমাদের মত সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে ভোট ভিক্ষার জন্য ধর্ণা দিয়েছিলেন, যারা মাটির আসনে বসে বলেছিলেন আমরা তোমাদেরই ভাই–আমরা তোমাদেরই একজন....তখন তারা মিশে গিয়েছিলেন আমাদের জনসাধারণের সঙ্গে আর আজ, আজ তারা মহারথী। জনসাধারণের করুণায় যারা গদি লাভ করলেন তারা আজ আমাদের নাগালের বাইরে। প্রয়োজনবোধে যদিও যাই নানা বাধার প্রাচীর ডিংগিয়ে প্রবেশের অধিকার নেই। তারপর যদিও প্রবেশ করলাম তাহলে চাই পরিচয়পত্র। পরিচয় যদি তেমন হয় তাহলেই অধিকার পাবো ভিতরে প্রবেশ করার। তারপর ভিতরে গিয়েও দেখবো মহারথীদের চারপাশে ঘিরে রয়েছেন তারা, যারা তার সমকক্ষ প্রায়। কথা বলার সুযোগ আসে না, শুধু দূরের আসনে বসে অথবা দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রহর গুণতে হয়। শীতাতাপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে প্রবেশ করে মন ভরে ওঠে, শরীর জুড়িয়ে যায়। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য। হয়তো মহারথী একটু কথা বললেন, নয় বললেন আর একদিন আসবেন সব শুনবো.....

বনহুর ভাবতেও পারেনি এমনভাবে তরুণী কথা বলতে পারে। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে বনহুর পিতা ও কন্যার মুখের দিকে।

তরুণী বলেই চলেছে–সে আশা আর পূরণ হয় না। সব ভরসা উবে যায় মন থেকে বরং চরম আঘাত খেয়ে ফিরে আসতে হয়। যেমন আমার ভাগ্যে জুটেছে চরম লাঞ্ছনা....ঐ মুহূর্তে যদি উনি পৌঁছতে না পারতেন.....কিন্তু কোথায় সে–তরুণী ফিরে তাকাতেই দেখলো যে স্থানে বনহুর দাঁড়িয়ে ছিলো ঐ স্থান শূন্য।

তরুণীর পিতাও কন্যার কথায় অন্যমনস্ক ছিলোনা, তিনিও অবাক হয়ে গেলেন। কন্যার উদ্ধারকারীকে তিনি প্রাণভরে কৃতজ্ঞতা জানাবার কথা ভুলেই গিয়েছিলেন।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় পিতা–কন্যা স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

বনহুর তাদের অগোচরে আলগোছে বেরিয়ে গেছে সেই কক্ষ থেকে।

*

মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বিশ্রামকক্ষ ত্যাগ করে নেমে এলেন নিচে।

স্ত্রী বললেন–সকাল সকাল ফিরে এসো–আজ তো তোমার অফিস নেই?

মন্ত্রী মহোদয় স্ত্রীর কথায় ভাবগম্ভীর কণ্ঠে বললেন–দুর্গত এলাকা পরিদর্শনে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।

গাড়িতে বসে বললেন–ড্রাইভার, সেই পুরোন হাউসে নিয়ে চলো।

স্যার, নিরাপত্তা বাহিনী......

ও সব লাগবে না। তুমি চলো। মন্ত্রীবাহাদুর গাড়িতে জেঁকে বসলেন।

ড্রাইভার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে চললো।

ড্রাইভার গাড়ি চালাতে গিয়ে মাঝে মাঝে পথ ভুল করলো।

মন্ত্রী বাহাদুর বললেন–নেশা করেছে না কি যে পথ ভুল করছিলো।

স্যার, আজ নেশা করিনি তবে কালকে নেশার মাত্রা একটু বেশি হয়েছিলো তাই–স্যার, এই পথে যাবো?

তুমি দেখছি নতুন লোকের মত কথাবার্তা বলছো?

স্যার, মাফ করে দিন, আজ বড় অসুস্থ বোধ করছি। মানে নেশার রেশ আমার এখনও কাটেনি স্যার, মাফ করুন আমার অনিচ্ছাকৃত দোষের জন্য.....

এই পথে চলো। ১৭৫ নং হীমসা বোড়।

স্যার, এবার আর বলতে হবে না, আমি ঠিক জায়গায় নিয়ে যাবো।

চল! মন্ত্রী বাহাদুর একবার নিজের মুখখানার ওপর হাত বুলিয়ে নিলেন। সদ্য শেভ করা প্রৌঢ় মুখখানাকে সজীব করে তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন মন্ত্রী

বাহাদুর। বারবার → বাকা করে তাকাচ্ছিলেন ড্রাইভিং আসনের আয়নাখানার দিকে।

ড্রাইভার আপন মনে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

একসময় গাড়িখানা এসে থামলো তার সেই পুরানো বাড়িটার সামনে।

গেটে দারোয়ান। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে সে সেলুট দিয়ে সরে দাঁড়ালো। গেট আপনা আপনি খুলে গেলো। গাড়িসহ ভিতরে প্রবেশ করলেন মন্ত্রী বাহাদুর।

ড্রাইভার গাড়ি থেকে নেমে দরজা খুলে ধরলো।

মন্ত্রী বাহাদুর নেমে দাঁড়ালেন। তার চোখেমুখে খুশির উচ্ছ্বাস। বললেন মন্ত্রী বাহাদুর–তুমি গাড়ি রেখে বাইরে যেতে পারে। আমার কাজ সমাধা হলে তোমাকে জানাবো।

স্যার, আপনাকে একা রেখে.....যাবো না।

বললাম তো কাজ শেষ হলে ডাকবো। কথাটা বলে মন্ত্রী বাহাদুর সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন ওপরে।

ড্রাইভার স্থিরনয়নে তাকালো বাড়িটার দিকে। পুরানো বাড়ি হলেও একেবারে ভাঙাচুরা নয়। তবুও কেমন যেন একটা ভয়াবহ থমথমে ভাব ছড়িয়ে আছে। ড্রাইভার একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলো। আপন মনে ধুমপান করতে লাগলো সে।

এমন সময় ঝাড়ুদার পাশ কেটে চলে যাচ্ছিলো, তার হাতে একগোছা চাবি।

ড্রাইভার বললো–এই শোনো।

ঝাড়ুদার এগিয়ে এলো।

বললো ড্রাইভার–শোনো, ঐ চাবির গোছা কোথাকার? মানে কোন্ ঘরের

সাহেবের ঘরের চাবি।

তোমার হাতে কেন?

এ বাড়ির সব দেখাশোনা আমিই করি।

ও! এ বড় চাবিটা?

গেটের চাবি!

তুমি কোথায় যাচ্ছ?

সাহেব বললেন চলে যেতে। যাবার সময় বড় গেট আটকে রেখে যেতে বললেন?

কেন?

কেউ যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে।

তুমি তো বাইরে যাচ্ছো?

হাঁ

তাহলে চাবিটা আমার কাছে দিয়ে যাও। আমি সাবধানে রাখবো, মোটেই হারাবো না।

বেশ, আপনি চাৰি রাখুন, আমি একটু পর ফিরে আসবো। দেখবেন স্যার, চাবির গোছা যেন আর কেউ না পায়।

না না, কেউ পাবে না। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যাও।

ঝাড়ুদার চাবির গোছা ড্রাইভারের হাতে দিয়ে চলে গেলো।

ঝাড়ুদার চলে যেতেই ড্রাইভার উঠে দাঁড়ালো।

চাবি খুলে প্রবেশ করলো ফটকের ভিতরে। সাংঘাতিক শক্ত আর মজবুত ফটক। ভিতরে প্রবেশ করতেই একটা শব্দ কানে এলো, কেমন যেন আর্তকণ্ঠস্বর।

কোনো নারীকণ্ঠের করুণ কণ্ঠ, না না, আমাকে আপনি মেরে ফেলুন। আমাকে আপনি মেরে ফেলুন, আর সহ্য করতে পারি না.....

ড্রাইভার সোজা সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলো ওপরে! এদিক ওদিক দেখে নিয়ে ভাইভার সোজা এগিয়ে গেলো দক্ষিণ দিকের বারান্দা ধরে। পাশে কয়েকটা ঘর, প্রতিটি ঘরে নানা ধরনের বাক্স ভাল করে সাজানো। ড্রাইভার বুঝতে পারলো এসব বাক্সে নানা ধরনের চোরাই মাল বোঝাই আছে, নইলে এমনভাবে রাখা হতো না।

নারীকণ্ঠের আর্তনাদ তীব্র নয়, ক্ষীণ আওয়াজ। অতি করুণ আর স্পষ্ট।

ভয়ংকর স্থান এটা।

যেখানে রয়েছে চোরা কারবার, নারী নিয়ে নাগর খেলা এখানে বিরাজ করছে একটা নরক যন্ত্রণা। ড্রাইভার দ্রুত পদক্ষেপে প্রবেশ করলো একটি মুক্তকক্ষে। কক্ষে প্রবেশ করে দেখলো একটা মূল্যবান সোফায় সম্মুখের টেবিলে কয়েকটা বোতল ও কাঁচপাত্র। তীব্র মদের গন্ধ ছড়িয়ে আছে সারা কক্ষে।

ড্রাইভার ক্ষণিক দাঁড়িয়ে তাকালো চারদিকে। চোখ দুটো তার জ্বলে উঠলো, আগুন ছড়িয়ে পড়লো কক্ষটার মধ্যে।

এবার সে পাশের কক্ষে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলো।

সঙ্গে সঙ্গে তার দৃষ্টি পড়লো কক্ষের একপাশে একটি খাটের দিকে। মন্ত্রী বাহাদুর একটি মহিলার বাঞ্চল হাতের মুঠোয় জড়িয়ে ধরে আছে।

মহিলার অর্ধউলঙ্গ দেহটাকে মন্ত্রী বাহাদুর দুহাত বাড়িয়ে জাপটে ধরতে যাচ্ছিলেন। ঠিক ঐ মুহূর্তে ড্রাইভার তার ক্ষুদ্র অথচ ভয়ংকর রিভলভারখানা উদ্যত করে বললো–খবরদার, ওকে স্পর্শ করবেন না,

চমকে উঠলেন মন্ত্রী বাহাদুর, বিস্ময়ভরা কণ্ঠে তিনি বললেন–ড্রাইভার, তুমি...

হাঁ আমি! মন্ত্রী বাহাদুর, অনেক দিন ধরে আপনার কার্যকলাপ লক্ষ্য করে আসছি, আজ আর রক্ষা নেই....।

মন্ত্রী বাহাদুর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে মুখে সাহস টেনে বললেন–জানো তোমার চাকরি যাবে?

অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো ড্রাইভার, বললো–চাকরি যাবার ভয় আমাদের নেই আপনাদের আছে, কারণ গদিচ্যুত হলে আপনাদের অবস্থা শোচনীয়। শুধু শোচনীয় নয় একেবারে মর্মান্তিক। জনগণ আপনাদের দেহের মাংস ছিঁড়ে খাবে......কিন্তু আপনার সে সুযোগ আসছে না, কারণ আমার চাকরি খাবার পূর্বে আপনার জান এটা দ্বারা খতম করা হবে

ড্রাইভার!

আপনার চোখ রাঙানি দেখবার জন্য আজ আর কেউ নেই। আপনি নিজকে রক্ষা করার জন্য চিৎকার করলেও কেউ শুনবে না, কারণ বড় গেটে আমি তালা বন্ধ করে দিয়েছি। আপনি যে মহিলার সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলেন তিনিও আপনাকে রক্ষার জন্য চেষ্টা নেবেন না, কারণ আপনার মত নরপশুর জীবন রক্ষার জন্য তারও কোনো ইচ্ছা নেই.....

ড্রাইভার, তুমি আমাকে হত্যা করতে চাও?

হাঁ, হত্যা করবো। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হবে না। আপনার লাশ শহরের কেন্দ্রস্থলে রেখে গলায় আপনার কীর্তির গুণগানসহ পোষ্টার লাগাবো। জনগণ বুঝবে তাদের স্বনামধন্য মন্ত্রী বাহাদুর কত মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। মুখোশের অন্তরালে যে আসল রূপ তাই বেরিয়ে আসবে

সত্যি তুমি আমাকে হত্যা করবে?

হাঃ হাঃ হাঃ, হত্যা করবো কিনা এতে এখনও আপনার সন্দেহ?

মন্ত্রী বাহাদুর ভয় ও বিস্ময় নিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বলে ওঠেন–ড্রাইভার তুমি, তুমি....

হাঁ, আমি সেই ব্যক্তি যে একদিন কান্দাই বাংলো থেকে আপনার মুখের গ্রাস উদ্ধার করে নিয়েছিলো।

তুমি দস্যু বনহুর?

চিনতে ভুল করেননি তাহলে? হে মহান অধিপতি, আর সুযোগ পাবেন না আপনারা। নারী নির্যাতন, জনগণের মালামাল কৌশলে আত্মসাৎ, ঐশ্বযের ইমারত গড়ে তোলার সাধ আর পূর্ণ হবে না। গদিতে বসে জনগণের সর্বনাশ করার সুযোগ আর পাবেন না....

এবারের মত মাফ করে দাও বনহুর!

তোমাদের মত নরপশুকে মাফ করার ক্ষমতা আমার নেই। মাফ চাও ঐ একজনের কাছে....কথাটা বলে আকাশের দিকে আংগুল তুলে ধরলো বনহুর। তারপর মন্ত্রী বাহাদুরকে টেনে নামিয়ে আনলো সে খাটের ওপর থেকে।

বলির পাঠার মত থরথর করে কাঁপছেন মন্ত্রী বাহাদুর।

বনহুর বললো—সরকারের টাকা খাচ্ছো, সঙ্গে খাচ্ছো জনগণের রক্ত। তাতেও তোমাদের উদর পূরণ হচ্ছে না, অসহায় নারীদের ইজ্জত লুটে নিতে তোমাদের একটুও দ্বিধা বোধ হয় না। জানি নিরীহ মানুষ বুঝেও নীরব থাকে, কারণ তোমরা তাদের ভাগ্যনিয়ন্তা, তোমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার মত সাহস কারও নেই। যদি কেউ তোমাদের আসল রূপের বর্ণনা দেয় বা লোকসমাজে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হয় তার পরিণাম হয় ভয়াবহ.....

না বুঝে ভুল করেছি, মাফ করে দাও।

একবার মাফ করেছিলাম তবু তোমার লালসা যায়নি। এবার মাফ করে দেবো তোমাকে জাহান্নামে পাঠিয়ে।

প্রাণে মেরো না বনহুর, আমাকে প্রাণে মেরো না। যা চাও তাই দেবো। কাতর কণ্ঠে বললেন মহামান্য মন্ত্রী বাহাদুর।

বনহুর আর একদণ্ড বিলম্ব করলো না, তার ক্ষুদ্র রিভলভারখানা গর্জে উঠলো। একটা তীব্র আর্তনাদ করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মন্ত্রী বাহাদুর।

বনহুর তাকালো মহিলাটির দিকে।

মহিলার দুচোখে ভয় বিহ্বলতা, আতঙ্কভরা কণ্ঠে বললো—আমাকেও হত্যা করুণ, আমাকেও হত্যা করুন...

বনহুর বললো–জানি না আপনি কে এবং কদিন এখানে আছেন।

দুহাতে মুখে ঢেকে কেঁদে উঠলো, কিছু বলতে চেষ্টা করলো কিন্তু বলতে পারলো না।

বনহুর পা দিয়ে চীৎ করে ফেললো মন্ত্রী বাহাদুরকে। চোখ দুটো তার গোলাকার হয়ে আছে। মুখখানা হা হয়ে আছে বিকটভাবে। হা করা মুখ দিয়ে ফেনাযুক্ত রক্ত গড়িয়ে পড়ছে।

বনহুর বললো–জানি আপনার ওপর নির্যাতন শুধু আজকের নয়, তবু এবার আপনি মুক্ত....চলুন আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আসুন আমার সঙ্গে। চলে আসুন, আর এক মুহূর্ত বিলম্ব করবেন না.....

মহিলা বললো–আজ দীর্ঘদিন আমাকে এখানে আটক রেখেছে। আমি জীব হয়ে আছি... সমাজে আমার স্থান নেই। আমি কোথায় যাবো?

আসুন আমার সঙ্গে। সমাজে স্থান পান কিনা আমি দেখবো। বনহুর আয়নায় দেখে নিলো নিজের পরিচ্ছদ। না, কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। দাড়ি গোফ ঠিকই আছে। জমশেদ আলী সে, মন্ত্রী বাহাদুরের বিশ্বস্ত ড্রাইভার......

মহিলাসহ ফিরে এলো বনহুর গাড়ির পাশে।

ঝাড়ুদার দাঁড়িয়ে ছিলো, তার চোখেমুখে একটা উদ্বিগ্নতার ছাপ ফুটে উঠেছে। ড্রাইভারকে সিঁড়ি বেরে নিচে নামতে দেখে এগিয়ে এসে বললো–চাবি নিয়ে আপনি চলে গিয়েছিলেন, সত্যি আমি ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

এই নাও চাবি। শোন আমি সাহেবকে নিয়ে ফিরে যাবো বলে ওপরে গিয়েছিলাম কিন্তু তিনি এখন যাবেন না বলে দিলেন, বড় ক্লান্ত তাই বিশ্রাম করছেন।

বনহুরের পেছনে মহিলাটিকে দেখে ঝাড়ুদার হকচকিয়ে গেলো। কারণ সে জানে মহিলাটি এখানে আছে এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে এ জন্য সর্বক্ষণ সাবধানতা বজায় রাখা হয়েছে। কিন্তু সেই মহিলা ড্রাইভারের সঙ্গে কেন?

ঝাড়ুদারের মুখোভাব লক্ষ্য করে বললো বনহুর–সাহেব বললেন ওকে নিয়ে যেতে তাই নিয়ে যাচ্ছি।

কোনো কথা বললো না ঝাড়ুদার।

ওর কাছে বিস্ময়কর লাগছে ব্যাপারটা।

যে মহিলার কথা সে আর বাবুর্চি ছাড়া কেউ জানতো না, সেই মহিলাকে ড্রাইভার নিয়ে যাচ্ছে...

গাড়ির দরজা খুলে ধরে বললো বনহুর–উঠে বসুন।

মহিলা গাড়িতে উঠে বসলো।

বনহুর বললো–কিছু ভেবো না। মন্ত্রী বাহাদুর জেগে উঠলেই আমি ফিরে আসবো। আর শোনো, যতক্ষণ তিনি কলিংবেল না বাজাবেন ততক্ষণ অপেক্ষা করবে, যেন তার পূর্বে ভিতরে প্রবেশ না করো।

আচ্ছা স্যার।

ততক্ষণে ড্রাইভ আসনে বসে গাড়িতে ষ্টার্ট দয়েছে বনহুর।

তার মুখে দাড়ি–গোঁফ পূর্বের মতই আছে।

কেউ তাকে দেখলে চিনতেই পারবে না যে সে ড্রাইভার জমশেদ আলী নয়।

চিনবেই বা কেমন করে, বনহুরের শুধু চোখ দুটো ছাড়া আর কোনো অংশ নজরে পড়ছিলো না। চাপদাড়ী, লম্বা বড় গোঁফ, মাথায় কাবুলী ধরনের পাগড়ি। প্রহরী নীরবে গেট খুলে দিলো।

বনহুর ড্রাইভ আসনে বসে সম্মুখে দৃষ্টি রেখে গাড়ি চালিয়ে চললো, কেউ তাকে বাধা দিলো না।

মন্ত্রী বাহাদুরের মৃতদেহ পড়ে রইলো তার নির্দিষ্ট কক্ষের মেঝেতে। হত্যা করা বনহুরের পেশা নয়–নেশা। এতটুকু বিচলিত হলো না তার মন। স্বাভাবিক ভাবে সে গাড়ি চালিয়ে চললো।

ঝাড়ুদার ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করে রইলো। কিন্তু কলিংবেল আর বাজে না। গাড়িও ফিরে এলো না। ঝাড়ুদার বসে বসে ঝিমুচ্ছিলো। এবার সে চাবি নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়লো ড্রাইভারের কথা। মন্ত্রী বাহাদুর বড় ক্লান্ত। তিনি বিশ্রাম করছেন, কেউ যেন তাকে বিরক্ত না করে।

আবার মাথা গুজলা ঝাড়ুদার।

আরামে ঝিমুতে লাগলো সে।

কেটে গেলো আরও কয়েক ঘণ্টা, হঠাৎ গাড়ির হর্ণ শুনে চমকে উঠলো ঝাড়ুদার। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দেখলো, এগাড়ি মন্ত্রী বাহাদুরের নয়। এটা তবে কোন গাড়ি?

সর্বক্ষণ মন্ত্রী বাহাদুরের নিকটে ভীড় জমে থাকে। তবে এখানে তো কোনো গাড়ি আসে না, বিশেষ কোনো সময় ছাড়া। গাড়িখানা এসে দাঁড়াতেই ভীষণ চমকে উঠলো ঝাড়দার। প্রথম মনে করেছিলো সে, হয়তো বা ড্রাইভার গাড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে কিন্তু এটা অন্য গাড়ি এবং গাড়িতে যিনি এসেছেন ঝাড়ুদার তাকে চেনে। ইনি মাঝে মধ্যেই আসেন, গোপনে চলে নানা ধরনের আলাপ আলোচনা।

ঝাড়ুদার সালাম জানালো।

মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে যে–সে ব্যক্তি আসতে পারেন না, জাদরেল ব্যক্তিরাই আসেন, কাজেই এব্যক্তি যে একজন মহারথী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভদ্র মহোদয় ঝাড়ুদারের দিকে তাকিয়ে বললেন–মন্ত্রী সাহেব আছেন?

আছেন। বললো ঝাড়ুদার।

ভদ্রলোকটি এবার গেটের তালা খুলে দেবার জন্য ইংগিত করলেন।

ঝাড়ুদার খুলে দিলো লোহার গেটখানা।

ভদ্রলোক সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন ওপরে।

আনন্দদীপ্ত মনে এগিয়ে চললেন ভদ্রলোক, তিনি জানেন মন্ত্রী বাহাদুর তাঁর নির্দিষ্ট কক্ষে বিশ্রাম করছেন। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, তবে কি মন্ত্রী বাহাদুরের ঘুম এখনও ভাঙেনি? খুব বেশি নেশা করেছেন–তাই হয়তো এখন পর্যন্ত সংজ্ঞাহীন আছেন। তবু দরজার পাশে এগুলেন, কিন্তু একি, দরজা খোলা কেন? দরজার মধ্য দিয়ে ভিতরে দৃষ্টি যেতেই ভীষণ চমকে উঠলেন ভুদ্রলোক– একটা ভয়ার্ত শব্দ তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো–খুন...

ঝাড়ুদার নিচে বসে ঝিমুচ্ছিলো।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন, তারপর দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলেন।

ঝাড়ুদার সজাগ হয়ে তাকাতেই ভদ্রমহোদয়ের ভয়ার্ত এবং উত্তেজিত মুখোভাব লক্ষ করে বলে উঠলো–স্যার, এখনই চলে যাচ্ছেন?

ভদ্রলোক বললেন–হা হা, চলে যাচ্ছি। কিন্তু শোনো, কাউকে বলবে না আমি এসেছিলাম।

আচ্ছা স্যার, কিন্তু....।

কোনো কিন্তু নয়, বলবে–কেউ আসেনি।

স্যার যদি জিজ্ঞাসা করেন তখন কি বলবো?

তিনি আর কোনোদিন কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। তুমি চুপচাপ বসে থাকো। হাঁ, চাবিটা ভাল করে আটকে দিও।

আচ্ছা স্যার।

ততক্ষণে ভদ্রলোক গাড়িতে উঠে বসে গাড়ি ছেড়ে দিয়েছেন। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই গাড়িখানা ফটক পেরিয়ে চলে গেলো।

গেটের পাহারাদারও কম অবাক হলো না।

ইনি এসে আর কেমন যেন দ্রুত চলে যাচ্ছেন, কেমন যেন তার হাবভাব, সবকিছু রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে। অবশ্য পাহারাদারের কাছে এসব তেমন

বিস্ময়কর নয়। কারণ প্রায়ই এ ধরনের আনাগোনা এখানে চলে আসছে।

পাহারাদার গেট বন্ধ করে দেয়।

ভদ্রলোকটি গাড়ি নিয়ে সোজা চলে আসলেন পুলিশ অফিসে।

কান্দাই পুলিশপ্রধান ভদ্রলোকটিকে চিনতেন। কারণ তিনি সাধারণ ব্যক্তি নন, একজন বিরাট নামকরা ব্যবসায়ী। এ ছাড়া তার আনাগোনা ছিলো মন্ত্রী মহলে, কাজেই এমন ব্যক্তিদের না চিনে প্রশাসন বিভাগের উপায় ছিলো না।

ভদ্র মহোদয়কে ব্যস্তসমস্ত হয়ে অফিসে প্রবেশ করতে দেখে উঠে অভ্যর্থনা জানালেন স্বয়ং পুলিশপ্রধান, তারপর বললেন–কি সংবাদ জনাব? আপনাকে খুব উত্তেজিত মনে হচ্ছে।

পুলিশ সুপারের কথার উত্তর না দিয়েই একটা চেয়ারে বসে পড়লেন ভদ্রলোক, বললেন–এক গেলাস পানি দিন…

বিস্ময়ভরা চোখে তাকিয়ে দেখছিলেন পুলিশপ্রধান। তিনি বুঝতে পারছেন না ব্যাপার কি ঘটেছে। তাড়াতাড়ি গার্ডকে বললেন এক গ্লাস পানি আনতে।

কক্ষে আরও যারা ছিলেন–তারাও কম অবাক হননি। ভদ্রলোক এমনভাবে হন্তদন্ত হয়ে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন যে, তা দেখে অফিস কক্ষের সবাই বিস্মিত হতভম্ব হয়ে পড়েছিলেন।

পানি এলো।

এক গ্লাস পানি ঢক ঢক করে এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেললেন ভদ্রলোক।

পুলিশপ্রধান নিজ আসনে একটু নড়েচড়ে বসলেন, এবং বললেন–বলুন কি ব্যাপার?

খুন।

খুন!

হাঁ!

কে কোথায় কাকে খুন করলো?

মন্ত্রী বাহাদুর খুন হয়েছে।

বলেন কি?

হাঁ মন্ত্রী বাহাদুর খুন হয়েছেন।

কোন্ মন্ত্রী বাহাদুর এবং কোথায় খুন হয়েছেন?

কান্দাইয়ের প্রধানমন্ত্রী....

এসব কি বলছেন আপনি?

তাহলে শুনুন আমি ঘটনাটা যতদূর জানি বলছি...তাদের গোপন ব্যবসার কথাটা সম্পূর্ণ গোপন রেখে যতটুকু বলা চলে তাই তিনি পুলিশপ্রধানকে বললেন।

পুলিশপ্রধান এক্ষুণি ফোন করলেন পুলিশ সুপারকে। ঘটনাটা অল্পক্ষণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো পুলিশমহলে।

পুলিশমহল গাড়ি নিয়ে ছুটলেন।

শুধু পুলিশমহল নয়, সেনাবাহিনীর নায়ক সেনাবাহিনী নিয়ে ঘেরাও করে ফেললেন সেই বাড়িটা।

জোর তদন্ত শুরু হলো।

প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু...কম কথা নয়, তাও স্বাভাবিকভাবে নয়–একেবারে খুন!

পুলিশমহল ঘোষণা করলো প্রধানমন্ত্রীকে তার বাসভবন থেকে জোরপূর্বক নিয়ে আসা হয় এবং তাকে একটি অজ্ঞাত বাড়িতে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। হত্যাকারিগণ সুস্থ মস্তিষ্কে হত্যাকাণ্ড সমাধা করে পালিয়ে যেতে সমর্থ হয়। তবে তাদের কোটি কোটি টাকার চোরাই মাল আটক করা হয়েছে।

সংবাদটা রেডিও ও টেলিভিশনে প্রচার করা হয় ফলাও করে।

শহরময় একটা আতঙ্কের ছায়াপাত হয়। পুলিশমহল যখন এই রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড নিয়ে গভীরভাবে তদন্ত করে চলেছেন, তখন নূরুজ্জামান চৌধুরী নূরকে ডাকা হলো।

নূর ঘটনাস্থল তদন্ত করে গম্ভীর হয়ে পড়লো। সে কোনো মন্তব্য না করে ডায়রী খুলে নিজে নোট করে চললো।

পুলিশপ্রধান এবং অন্যান্য পুলিশ অফিসার নূরকে কোনো রকম প্রশ্ন না করে দেখে যাচ্ছিলো। প্রথমে নূর বাড়িখানার বাইরে ঘুরে দেখলো এবং কিছু নোট করে নিলো। তারপর অন্যান্য কক্ষ তদন্ত করে দেখতেই মুখমণ্ডল গম্ভীর এবং ভ্রুযুগল ভ্রুকুঞ্চিত হয়ে পড়লো। ডায়রীর পাতায় খচ খচ এ লিখে যাচ্ছে নূর, কি লিখছে সেই জানে।

ভাবগম্ভীর নূর।

পুলিশ সুপার এবং আরও কয়েকজন পুলিশপ্রধান তার আশেপাশে।

প্রতিটি কক্ষ তদন্ত করে দেখছে নূর।

পুলিশপ্রধানকে লক্ষ্য করে বললো–সে–এ বাড়িটা স্বাভাবিক নয়। এ বাড়ির ভিতরে শুধু অসৎ কাজই সমাধা হয় না, এটা একটা স্মাগলারদের আড্ডাখানাও।

হাঁ মিঃ নূর, আমরাও এ রকম মনে করছি। কারণ বাড়িখানার অভ্যন্তরে যে কক্ষগুলো রয়েছে প্রতিটি কক্ষে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের মাল। এ মালামাল কোনো সৎ ব্যবসায়ীর নয়।

ঠিক বলেছেন মিঃ আহমদ। শুধু অসৎ ব্যবসাই চলে না এখানে, এ বাড়ির অভ্যন্তরে চলে নানা রকম কুকর্ম। যেমন আমার মনে হয় মন্ত্রী সাহেবকে কেউ জোর–জবরদস্তি করে এখানে আনেনি, তিনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন। ঝাড়ুদারের বক্তব্যে জানা যায় একটি মহিলাকে এখানে আটক রাখা হয়েছিলো।

বললেন পুলিশ সুপার–এ কথা সত্য! ঝাড়ুদারের মন্তব্যে জানা গেছে মন্ত্রী সাহেবের ড্রাইভার একটি মহিলা সহ নিচে নেমে আসে এবং সে তার গাড়িতে মহিলাটিকে নিয়ে চলে যায়। তারপর সে গাড়ি নিয়ে ফিরে আসেনি।

নূর মন্ত্রী বাহাদুরের প্রাণহীন দেহ ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখলো, তারপর বিছানা ও আসবাবপত্র পরীক্ষা করে স্থির গলায় বললো–এই কক্ষে যে মহিলা বাস করতেন, তিনি বহু দিন যাবৎ ছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পাশের কক্ষে মদের বোতল আর সিগারেট কেসে সদ্য পান করা অর্ধদগ্ধ সিগারেট…মন্ত্রী বাহাদুর স্বাভাবিক অবস্থায় নিহত হননি….

হাঁ, তাই মনে হচ্ছে।

অপর একজন পুলিশ অফিসার কিছু মন্তব্য করলেন এবং পুলিশ অফিসারগণ যারা এতক্ষণ গম্ভীরভাবে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন তারা নিজেরা আলাপ–আলোচনার মাধ্যমে ডায়রী লিখে নিতে লাগলেন।

কিছু সময়ের মধ্যে বাড়ির সম্মুখে ভীড় জমে উঠলো। ভীষণ এক অবস্থার সৃষ্টি হলো সেখানে। মন্ত্রী বাহাদুরের স্ত্রী কন্যা আত্মীয় স্বজন সবাই এসে উপস্থিত হলো।

কান্না আর শোকে ভেঙে পড়লো সবাই।

সাংবাদিকগণ নানাভাবে রিপোর্ট গ্রহণ করতে লাগলেন।

লাশ মর্গে পাঠানো হলো।

বাড়িখানাতে পুলিশ গার্ড প্রহরারত রইলো।

শহরময় মহা হুলস্থুল পড়ে গেলো। প্রধানমন্ত্রীর বিস্ময়কর মৃত্যু জনগণকে ভীষণ ভাবিয়ে তুললো।

*

নিস্তব্ধ রাত।

নূর গভীরভাবে চিন্তা করে চলেছে।

ঘরের আলো নেভানো।

আকাশে চাঁদ হাসছে।

জানালা দিয়ে জোছনার আলো ছড়িয়ে পড়েছে খাটের ওপরে।

নূর সিগারেট পান করছিলো আর ভাবছিলো মন্ত্রী বাহাদুরের অদ্ভুত মৃত্যুর কথা। মন্ত্রী বাহাদুরকে এমন অবস্থায় হত্যা করা হয়েছে যখন তিনি মদ ও নারী নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। পকেট থেকে একটা ভাঙা কাঁচের চুড়ির অংশ বের করলো নূর। জোছনার আলোতে চিকচিক করছিলো চুড়ির টুকরাখানা। মন্ত্রীসাহেব যে খাটের পাশে নিহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন সেই খাটের ওপরে বিছানায় নূর একা পেয়েছিলো। সবার অলক্ষ্যে তুলে নিয়ে পকেটে রেখেছিলো ওটাকে।

মন্ত্রী বাহাদুর নিহত হবার পূর্বে আরও কিছু স্বনামধন্য ব্যক্তি নিহত হয়েছিলেন......তাঁদের মৃত্যু হয়েছিলো বিস্ময়কর.... এবং সে সব হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিলো গভীর রহস্য.... সে রহস্য উদঘাটন করতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিলো নূরকে...কিন্তু এই হত্যা রহস্যও আমাকে উদঘাটন করতে হবে....আপন মনে বলে ওঠে নূর।

এমন সময় পাশে এসে দাঁড়ায় একটা ছায়ামূর্তি।

নূর চমকে সোজা হয়ে বসলো, বললো–কে তুমি?

আংগুলের অর্ধদগ্ধ সিগারেটখানা গুঁজে রাখলে পাশের এ্যাসট্রের মধ্যে।

বললো–কে.... কে তুমি?

নূরের পাশে বসলো ছায়ামূর্তি, বললো সে–ভাল করে তাকিয়ে দেখো আমার দিকে!

নূর জোছনার আলোতে তাকালো ছায়ামূর্তির দিকে। সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট কন্ঠে বললো–আব্বু তুমি!

নূর, যখন তুমি ভাবছিলে মন্ত্রী বাহাদুরের লাশটার পাশে দাঁড়িয়ে, তখন আমি তোমার পাশেই ছিলাম।

আমার পাশে?

হাঁ, পুলিশ অফিসারের বেশে আমি তোমার ডান পাশে দাঁড়িয়ে তোমার এবং অন্যান্য সবার কার্যকলাপ লক্ষ্য করছি লোম।

আব্বু! আব্বু তুমিই তাহলে...

নূর, আমিই হত্যা করেছি মন্ত্রী বাহাদুরকে!

আব্বু তুমি! তুমি এ কাজ করেছো?

হাঁ।

আমিও তাই ভাবছিলাম। কারণ এমন নিপুণতার সঙ্গে এই হত্যাকাণ্ড সমাধা করা হয়েছে যাতে এতটুকু ক্লু খুঁজে না পাওয়া যায়। একটু থেমে বললো নুর–তখনই আমার সন্দেহ জেগেছিলো। কিন্তু এমন করে আর কতদিন তুমি এই হত্যালীলা চালিয়ে যাবে?

যতদিন সাধুতার মুখোশ পরে জানোয়ারগুলো মানুষের সর্বনাশ করবে।

তুমি কি জানো না একজনের পর একজন, এমনি করে শত শত মুখোশধারী অসৎ ব্যক্তির জন্ম হবে। কোনোদিন তুমি এদের ধ্বংস করতে পারবে না।

হাসলো বনহুর।

জোছনাভরা আবছা অন্ধকার।

অদ্ভুত লাগছে ওকে।

নূর বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে তার আব্বুর দিকে। আজ আর তার কাছে গোপন নেই তার আব্বুর পরিচয়। যত সে আব্বুকে দেখে তত অবাক হয়। একদিন যে ছিলো তার কল্পনার বস্তু আজ সে তার সত্যিকারের আব্বু....

বললো বনহুর–ধ্বংস নয়–নির্মূল।

হা আর, এদের তুমি পারবে নির্মূল করতে

আমি না পারলেও আমার মত আরও শত শত লোক জন্মাবে যারা নির্মূল করবে বা করতে চেষ্টা করবে ঐ নরপশুদের। দেশ আজ এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, মানুষ আজ অমানুষে পরিণত হয়েছে। ক্ষুধার জ্বালা নিবারণে তারা ডাবীন হাতড়াচ্ছে, নর্দমা থেকে পচা ফেন তুলে নিয়ে খাচ্ছে। অখাদ্য কুখাদ্য খেয়ে নানা রকম অসুখে ভুগছে। কুকুর আর মানুষের চলেছে খাদ্য নিয়ে কাড়াকাড়ি...অথচ এই স্বনামধন্য ব্যক্তিরা গদিতে সমাসীন থেকে দেশ ও দশের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে দিব্যি আরামে কালাতিপাত করবে? না, তা হতে দেবো না আমি। নূর, তুমি একজন দক্ষ ডিটেকটিভ, যখন সে কাজ করবে তার আসর রূপ উদঘাটন করে তারপর যা ভাল মনে করবে তাই করো। নইলে আমি তোমাকে ক্ষমা করবো না....

তুমিও রেহাই পাবে না আব্বু, যদি তুমি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করো বা অন্যায় কাজে লিপ্ত হও....তবে আমি জানি তুমি অন্যায় কাজ করবে না কোনোদিন।

নূর!

হাঁ আব্বু! তবে একদিন তোমাকে ভুল বুঝেছিলাম। সেদিন আমি ভাবতাম তুমি অন্যায় কাজ করে আনন্দ পাও! আজ সে ভুল আমার ভেঙে গেছে।

আমি এতবেশি খুশি হয়েছি নূর যা প্রকাশ করতে পারছি না। কথাটা বলে বনহুর টেনে নিলো নূরকে বুকে।

পিতা–পুত্রের অপূর্ব মিলন নির্জন কক্ষের শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশকে অপরূপ করে তুললো।

বনহুর স্নেহভরে নূরের চিবুকে চুম্বন দিয়ে বললো–কর্তব্য কাজে জয়ী হও– বেরিয়ে গেলো বনহুর।

নূর স্তব্ধ হয়ে বসে আছে বিছানার পাশে, ভাবছে তার আব্বুর কথা। একদিন বনহুরকে গ্রেপ্তার করার জন্য ভীষণ আগ্রহী ছিলো সে...আর আজ

হঠাৎ গুলীর শব্দ।

চমকে উঠলো নূর।

ছুটে গেলো সে জানালার পাশে। দেখলো দারোয়ান গেটের একপাশে পাইন ঝাড়ের আড়ালে দাঁড়িয়ে গুলী ছুড়ছে।

নূর সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলো নিচে।

দারোয়ান পুনরায় রাইফেল থেকে গুলী নির্গত করতে যাচ্ছিলো ঠিক ঐ মুহূর্তে নূর রাইফেল নামিয়ে দিলো—গুলি ছুঁড়ো না।

স্যার, একটা ছায়ামূর্তি আপনার কক্ষের শার্শীর ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পাইপ বেয়ে নেমে গেলো।

ওটা তোমার চোখের ভুল, কারণ আমি আমার কক্ষে জেগেই ছিলাম।

স্যার, ভূল নয়, আমি গুলী ছুঁড়েছি, ছায়ামূর্তির দেহে গুলীবিদ্ধ হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে।

কি বললে? ছায়ামূর্তির দেহে গুলী বিদ্ধ হয়েছে বলে তোমার ধারণা?

হাঁ স্যার, আমি স্পষ্ট দেখলাম, জোছনার আলোতে দিব্যি দেখলাম একটা জমকালো পোশাকপরা লোক

চলো দেখি, ব্যস্তকণ্ঠে বললো নূর।

দারোয়ানের হাত থেকে টর্চ নিয়ে এগুলো নূর, পেছনে রাইফেল নিয়ে দারোয়ান। যদিও জোছনার আলোতে স্পষ্ট দেখাচ্ছিলো সব তবু নূর টর্চ জ্বেলে এগুতে লাগলো।

মনে তার ভীষণ উদ্বিগ্নতা।

সত্যি কি দারোয়ানের গুলী তার আব্বুর দেহে বিদ্ধ হয়েছে। না না তা হতে পারে না, কারণ তার আব্বু কোনো অন্যায় করেনি। হঠাৎ এক স্থানে কিছু তাজা রক্ত নজরে পড়লো, চমকে উঠলো নূর তবে কি তার আব্বু আহত হয়েছে।

দারোয়ান নূরকে ভাবতে দেখে বললো–স্যার, ছায়ামূর্তি নিশ্চয়ই দস্যু বনহুর এবং আমি তাকে আহত করেছি। গুলীটা ঠিকভাবে চালাতে পারলে তাকে নিহত করতাম।

নূর বললো–যাক তুমি যা করেছে তাতেই তোমাকে বাহাদুর বলতে হয়। তবে সেই যে দস্যু বনহুর তা কেমন করে অনুমান করলে?

স্যার শুনেছি দস্যু বনহুর জমকালো পোশাকরা অবস্থায় দস্যুতা করে থাকে।

তাহলে দস্যু বনহুর কি আমার বাংলোয় এসেছিলো দস্যুতা করতে?

হয়তো তাই হবে স্যার।

নূর আর কথা না বাড়িয়ে ফিরে গেলো। কিন্তু মনটা তার ভীষণ খারাপ হয়ে গেলো, কারণ সত্যি তার আব্বু আহত হয়েছে এবং তারই দেহের রক্ত জমাট বেঁধে আছে যা সে একটু পূর্বে বাগানে দেখতে পেয়েছিলো।

শয্যা গ্রহণ করতে পারলো না নূর, একটা দারুণ উৎকণ্ঠা তাকে ভাবিয়ে তুললো।

দস্যু বনহুর এসেছিলো তার বাংলোয়, কথাটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার শুরু হবে নতুন এক আলোড়ন। এ নিয়ে মেতে ওঠবে পুলিশমহল, কাজেই ব্যাপারটা যাতে না ছড়ায় এ জন্য দারোয়ানকে ডেকে এ ব্যাপারে চুপ থাকার নির্দেশ দেওয়াই ভাল।

নূর বলে দিলো দারোয়ানকে।

সত্যিই যখন নিজ চোখে দেখা নয় তখন কিছু মন্তব্য রাখা উচিত হবে না। বিশেষ করে নূর নিজে ডিটেকটিভ, কাজেই সে নিজে খুঁজে বের করতে চায় কে এসেছিলো তার বাংলোয়।

দারোয়ান বললো–ঠিক আছে স্যার, আপনার কাজের কোনো অসুবিধা হোক এটা আমি চাই না, তবে যে এসেছিলো সে ভাল কোনো অভিসন্ধি নিয়ে আসেনি এবং আমি তাকে ঘায়েল করেছি।

*

একি, তোমার শরীরে রক্ত! স্বামীর দিকে তাকিয়েই ভীত ও ব্যস্তকণ্ঠে বললো মনিরা।

বনহুর একটা আসনে বসে পড়ে বললো–পায়ে গুলী লেগেছে। একটা ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দাও মনিরা, রক্তপাত বন্ধ করতে হবে।

উঃ! কি মানুষ তুমি!

আজ নতুন নয় তবে তোমার ছেলের ওখানে গিয়েই

নূর, নূর তোমাকে গুলী বিদ্ধ করেছে?

না।

তবে?

সব পরে বলছি তুমি তাড়াতাড়ি করো..

মনিরা ক্ষিপ্র হস্তে সুটকেস খুলে বের করলো ব্যাণ্ডেজ, দ্রুত ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলো।

মনিরা বললো–তুমি কবে শান্ত হবে বলে তো?

বললো বনহুর–যেদিন সময় আসবে।

মামীমাকে সব বলে দেবো।

মা তাতে কষ্টই পাবেন কিন্তু কোনো কিছু করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

কি সন্তান হয়েছিলে তুমি!

বড় অদ্ভূত আর বিস্ময়কর।

তার চেয়েও বেশি তুমি…বলোত এমন করে গুলী বিদ্ধ হয়েছে যদি হৃৎপিণ্ডে গুলীটা গেঁথে যেতো?

তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম। আঃ কি শান্তিই না পেতাম মনিরা।

তুমি বড্ড ইয়ে

তা তো জানোই তবু কেন আমাকে এসব বলো মনিরা। কথাটা বলে বনহুর মনিরার বুকে মাথা রাখলো।

মনিরা গভীর আবেগে স্বামীর চুলে হাত বুলিয়ে চললো।

বললো বনহুর–মনিরা জানি, তুমি বিরক্ত হও আমার আচরনে কিন্তু পারি না নিজের স্বভাব পাল্টাতে। হয়তো জীবনে এমনিই রয়ে যাবো। বড় হতভাগা আমি…

বলেছি নিজেকে কোনোদিন হতভাগা বলবে না। তুমিই মাত্র পুরুষ যার মধ্যে আছে পৌরুষত্ববোধ। মৃত্যুকে তুমি ভয় পাও না। ভয় পাও না তুমি কোনো কিছু….তুমি হতভাগা কিছুতেই হতে পারো না।

মনিরা!

সত্যি তুমি….

তোমার কাছে আমি অনেক বড় কিন্তু

না, কোনো কিন্তু নয়।

সব কথা তুমি আজও জানো না মনিরা। জানলে আমাকে তুমি ক্ষমা করতে পারবে না।

যতটুকু জানি ততটুকুই আমার জন্য যথেস্ট, আর আমি জানতে চাই না।

মনিরা!

গভীর আবেগে বনহুর মনিরাকে টেনে নেয় কাছে।

বলে মনিরা–তোমার অনেক রক্তপাত হয়েছে। ডাক্তার ডাকা দরকার

ডাক্তার এতরাতে কোথায় পাবে? তাছাড়া জানোত ডাক্তার কিছুতেই আমাকে সহজে ছেড়ে দেবে না।

আমি তোমার কোনো কথা শুনবো না। যত টাকা লাগুক আমি ডাক্তার আনবো এবং তার মুখ বন্ধ করবো।

মনিরা!

তুমি বিছানায় শুয়ে পড়ো, আমি ফোন করবো।

কিন্তু…

কোনো কিন্তু নয়, চুপ করে শুয়ে পড়ো।

মনিরা, জানো না আমি প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করেছি।

তুমি–তুমিই প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা করেছো! ঢোক গিললো মনিরা। চোখ দুটো তার ছানাবড়া হয়ে উঠেছে। প্রধানমন্ত্রীর হত্যাকাণ্ড নিয়ে শহরময় একটা মহা হৈ চৈ পড়ে গেছে, হত্যাকারীর সন্ধানে পুলিশ চষে বেড়াচ্ছে। কিছুদিন পূর্বে আরও কয়েকটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে, যা শুধু পুলিশমহলকেই আতঙ্কগ্রস্ত করেনি, সমস্ত শহরটাকে ভাবিয়ে তুলেছে।

মনিরা স্বামীর মুখে কথাটা শুনে চমকে উঠলো, এবার সে বুঝতে পারলো কান্দাই শহরে যে স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ খুন হয়েছেন এবং হচ্ছে তাদের হত্যাকারী কে।

কি ভাবছো মনিরা?

তুমি এখনও তেমনটিই আছ।

কেন?

আমি কিছু বলবো না, শুধু মামীমাকে ডাকবো।

এই গভীর রাতে বুড়ো মাকে ডেকে আর তাকে কষ্ট দিও না।

তুমি এখনও ছেলেমানুষি করবে, আর আমি তোমার জন্য ভেবে ভেবে মরবোর

কে বলেছে তোমাকে আমার জন্য ভাবতে? আমি বেঁচে থাকবো যতদিন ততদিন তোমাদের ভাবনার অন্ত থাকবে না। বরং আমার মৃত্যু হলে তোমরা নিশ্চিন্ত হবে।

উঃ! কি সাংঘাতিক মানুষ তুমি! যাক কোনো কথা শুনবো না, আমি ডাক্তারের কাছে ফোন করবো।

মানে আমাকে ধরিয়ে দিতে চাও পুলিশের হাতে?

কথা না শুনলে ধরিয়েই দেবো, আর সহ্য হয় না। ইস! রক্তে ভিজে গেছে যে ব্যাণ্ডেজখানা!

যেতে দাও।

মনিরা রিসিভার তুলে নিলো হাতে।

বনহুর মনিরার হাত থেকে রিসিভার নিয়ে রেখে দিলো, তারপর বললো– আমাকে তুমি থাকতে দিলে না দেখছি।

ঐ সময় বাইরে কতকগুলা পদশব্দ শোনা যায়।

বনহুর আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে মনিরার কক্ষের দেয়াল সংলগ্ন সুড়ঙ্গপথে নিচে নেমে যায়। সঙ্গে সঙ্গে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ হয়ে যায়! দেয়াল যেমন ছিলো তেমনি হয়ে গেলো।

দরজায় ভেসে আসে সরকার সাহেব এবং আরও কয়েকজনের কণ্ঠস্বর।

সরকার সাহেব ডাকেন–বৌ-মা দরজা খোলো।

মনিরা দরজা খুলে দিলো, কারণ সে ভালভাবে জানে তার স্বামী অন্তর্ধান হয়েছে। আরও সে বুঝতে পেরেছে নিশ্চয়ই পুলিশবাহিনী এসেছে, হয়তো বা টের পেয়েছে বনহুর এখানে এসেছে। মনিরা দরজা খুলে দিতেই পুলিশ সুপার নূরকে বললেন–আপনি আগে ভিতরে প্রবেশ করুন।

চমকে উঠলো মনিরা নূরকে পুলিশমহলের সঙ্গে দেখে, কারণ মনিরা জানে নূরের কাছে কিছু গোপন নেই। বনহুরের সঙ্গে নূরের কি সম্পর্ক তা জানে নূর

কেন সে পুলিশমহলের সঙ্গে এসেছে…

মনিরার মনের প্রশ্ন মনেই রয়ে গেলো।

বললো নূর–আম্মু, তোমার ঘরে কেউ এসেছিলো? কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেঝের কার্পেটে খানিকটা রক্তের দাগ নজরে পড়লা নূরের। নূর গম্ভীর হয়ে পড়লো এবং একটা পা দিয়ে রক্তের দাগটা ঢেকে ফেললো সে সবার অলক্ষ্যে।

মনিরা নিশ্চুপ।

নূর বললো–আপনারা অহেতুক কষ্ট করে এলেন। আমি জানি এখানে কেউ আসেনি।

নূরের কথার পর পুলিশ আর কথা বাড়াতে পারলো না, তাঁরা সবাই ফিরে চললো।

নূর পুলিশমহলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে ফিরে এলো মায়ের ঘরে।

মনিরা তখনও হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো দরজার পাশে।

নূর পাশ কাটিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে বললো–সত্যি করে বলতো আম্মু আব্বু এসেছিলো। এখানে?

তবু মনিরা নিশ্চুপ।

আবার বললো নূর–জবাব দাও আম্মু, আব্বু এসেছিলো এখানে? মিথ্যা কথা বলো না, কারণ। আমি জানি আব্বু এখানে এসেছিলো।

কে বলেছে তোর আব্বু এখানে এসেছিলো?

ঐ রক্ত…নূর আংগুল দিয়ে কার্পেটের রক্তের দাগ দেখিয়ে দিলো। মনিরার দুচোখ ভরে পানি এলো।

নূর বললো–চুপ করে থেকো না আম্মু সঠিক জবাব দাও? আব্বু কোথায় এবং কেমন আছে?

নূর!

আম্মি, আমি সব জানি। আব্বু আমার বাংলোয় গিয়েছিলো, সেখানেই আহত হয়।

নূর, তুমি জেনেশুনে তোমার আব্বুর পায়ে…

তাহলে আব্বুর পায়ে আঘাত লেগেছে। উহ আমাকে নিশ্চিন্ত করলে, কারণ আমি এতক্ষণ ভাবছিলাম আব্বুর শরীরে গুলীবিদ্ধ হয়েছে।

মনিরা কতকটা নিশ্চিন্ত এবং শান্ত হলো।

নূর বললো–আম্মু সত্য করে বলো আব্বু কোথায়? তার পায়ের ক্ষত কতখানি মারাত্মক। হয়েছে অনেক রক্ত পড়েছে আমি জানি। বলল আম্মু, চুপ করে থেকো না, বলো?

তোমার আব্বু চলে গেছে।

চলে গেছে!

হাঁ।

তাহলে তার চিকিৎসা

আমি ডাক্তার ডাকবো ভাবছি ঠিক ঐ সময়…

আমরা এসে গেছি, এই তো

হাঁ বাবা তাই….

এমন সময় বৃদ্ধ সরকার সাহেব এলেন। তিনি নিচে নেমে গিয়েছিলেন পুলিশমহলকে বিদায় জানাতে। এবার ফিরে এসে বললেন–নূর, কি খবর বলতো দাদু?

কিছু না সরকার দাদা।

কিছু না বললেই হলো! মেঝেতে আমি রক্তের দাগ দেখেছি। তুই চট করে জুতো দিয়ে ঢাকা দিলি?

তোমার ঐ ঘোলাটে চোখে তাও ধরা পড়েছে।

হাঁ দাদু, চোখ ঘোলাটে হলেও দৃষ্টিশক্তি হারাইনি।

শোন, আব্বুর পায়ে চোট লেগেছে এবং তা আমার ওখানেই লেগেছিলো। আমার দারোয়ানের কীর্তি ওটা।

মনিরা বললো–দারোয়ানকে কিছু বললি না?

আম্মু, কর্তব্য মুহূর্তে আমাকেও ঠিক ঐভাবে কাজ করতে হতো। দারোয়ান তার কর্তব্য পালন করেছে।

মনিরা বসে পড়লো একটা চেয়ারে।

নূর মায়ের মাথায় এবং পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলো।

সরকার সাহেব চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

*

নূর সবার দৃষ্টি এড়িয়ে কান্দাই পর্বতের পাদমূল হয়ে কান্দাই জঙ্গলে প্রবেশ করবে বলে রওয়ানা দিলো। মা কিংবা সরকার সাহেবকেও বললো না নূর, এমন কি প্রশাসন বিভাগ কিংবা পুলিশমহলেও কেউ জানলো না। উদ্দেশ্য তার আব্বু বনহুরকে খুঁজে বের করা। মায়ের ঘরে সুড়ঙ্গপথে নূর প্রবেশ করতে চেষ্টা করেছে কিন্তু সক্ষম হয়নি। এমনভাবে সুড়ঙ্গমুখ ভিতর থেকে বন্ধ করা হয়েছিলো যে নুরের সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

সবার অগোচরে নূর তার গাড়ি নিয়ে রওয়ানা দিয়েছে।

আপন মনে সে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে।

দৃষ্টি তার পথের চারপাশে সন্ধান করে ফিরছে।

নিশ্চয়ই এই পথে তার আব্বু ফিরে এসেছে অথবা কোথাও বসে বসে ধুকছে, কারণ সে আহত।

বনহুর কিন্তু সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করে ভালভাবে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিয়েছিলো, কারণ পুলিশ যেন কোনোক্রমে টের না পায় এখানে কোনো পথ আছে।

এ কারণেই নূর মায়ের ঘরের সুড়ঙ্গপথের সন্ধান পেয়েও পারেনি তাতে প্রবেশ করতে। তার আব্বু আহত, তাকে খুঁজে বের করতেই হবে, কিন্তু কোথায় সে।

বহু সন্ধান করেও নূর বনহুরকে পথের ধারে বা পথের আশেপাশে পেলো না। এবার নূর গাড়ি রেখে এগুলো–এপথ তার কতকটা চেনা। এ পথেই তাকে পাকড়াও করে আনা হয়েছিলো এবং সেটা ছিলো দস্যু বনহুরের আস্তানা। নূর ইচ্ছা করেই আজ এগুচ্ছে, তাকে যদি কেউ পাকড়াও করে নিয়ে যায় সে বাধা দেবে না। কারণ সেখানে গেলেই নূর দেখবে তার আব্বুকে....

ভাবছে আর এগুচ্ছে নূর।

হঠাৎ নূপুরের শব্দ তার কানে ভেসে এলো।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দৃষ্টি তার চলে গেলো দূরে একটা ঝর্ণার ধারে। নূর দেখলো সেই তরুণী আপন মনে নৃত্য করছে। এ যে ফুল্লরা, তার স্বপ্ন সাধনা, ওকে নূর ভালবাসে। নূর আবেগভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

অপূর্ব সে নাচ।

এমন নাচ সে আরও একবার এই জঙ্গলে দেখেছিলো এবং সেই তরুণীই আজকের এই মায়ামৃগ যাকে দেখা যায় কিন্তু স্পর্শ করা যায় না।

নূর আরও এগুলো।

ভয় হচ্ছে তাকে দেখলেই যদি সে পালিয়ে যায় গভীর জঙ্গলের মধ্যে। আর সে খুঁজে পাবে না তাকে।

নূর অতি সন্তর্পণে এগুলো।

ফুল্লরা আপনমনে নেচে চলেছে। নাচ ফুল্লরার নেশা। রোজ সে আপন মনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে এবং খুশিমত নাচবে।

জাভেদ চলে যাওয়ার পর থেকে সে এমনি করে একা একা নাচে সময়ে অসময়ে।

কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, আবার কখনও ঝর্ণার পানি দিয়ে ছড়িয়ে দেয় হরিণ শিশুটার গায়ে।

নাচ থেমে গেলো।

নূর পা টিপে টিপে এক সময় অতি নিকটে এসে পড়েছে।

ফুল্লরা ঝর্ণার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

কাকচক্ষুর মত সচ্ছ পানির দিকে তাকিয়ে ভাবছে হয়তো বা জাভেদের কথা। জাভেদ… না জানি সে এখন কোথায়…

নুর অতি সন্তর্পণে ফুল্লরার পিঠে হাত রাখলো।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে ফিরে তাকালো ফুল্লরা, সে মনে করেছে জাভেদ হয়তো ফিরে এসেছে সেই তার পিঠে হাত রেখেছে, কিন্তু নূরকে দেখে মুখখানা তার গম্ভীর হয়ে পড়লো।

নূর বললো–ফুল্লরা, আমাকে চিনতে পারছে না?

ফুল্লরা কোনো কথা না বলে ছুটে পালাতে গেলো।

খপ করে নূর ধরে ফেললো ওর হাতখানা।

যাচ্ছো কেন, শোনো?

ফুল্লরা ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিয়ে তাকালো নূরের দিকে।

নূর হেসে বললো–এ বনে তুমি থাকো, তুমি চঞ্চল হরিণীর মত–তুমি সুন্দর! আমাকে তোমার এত ভয় কেন?

ফুল্লরা কোনো কথা বললো না, সে হাতখানা ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো।

নূরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠা থেকে ফুল্লরা পারলো না নিজকে মুক্ত করতে। বন্দী হরিণীর মত সে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

হেসে বললো নূর–তোমার নামটা আমি ভুলিনি ফুল্লরা।

ফুল্লরা বললো–ছেড়ে দাও আমাকে।

ভয় নেই, আমি মানুষ। নূর ওর হাতখানা মুক্ত করে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। পুনরায় বললো–তুমি যাবে আমার সঙ্গে? আমার মা তোমাকে দেখলে খুব খুশি হবেন।

ফুল্লরা কোনো জবাব দিলো না, সে পালাবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠলো।

নূর বুঝতে পারলো ওকে এত সহজে বশে আনা যাবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস নুরের বুক চিরে বেরিয়ে এলো, সত্যি ফুল্লরাকে নূর অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেলেছে। জানে না সে তার ভালবাসায় জয়ী হবে কিনা। বললো নূর–তুমি কি জানো তোমাদের সর্দার আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

চমকে উঠলো ফুল্লরা।

বিস্মিত হয়ে বললো–সর্দার আহত হয়েছে।

হাঁ

তুমিই তাকে আহত করেছো, নাহলে তুমি জানলে কেমন করে?

আমি জানি তবে আমি তাকে আহত করিনি।

তোমাকে আমি বিশ্বাস করি না।

ফুল্লরা!

আমাকে তুমি নাম ধরে ডাকবে না।

কেন?

তুমি কে, আমি তোমাকে চিনি না।

তবে সেদিন তুমি আমাকে বন্দী অবস্থা হতে মুক্ত করে দিয়েছিলে কেন?

জানি না। কথাটা বলে চলে যাচ্ছিলো ফুল্লরা।

নূর বললো–শোন!

ফুল্লরা থমকে দাঁড়ালো।

নূর কয়েক পা সরে এলো তার পাশে, বললো–শোনো ফুল্লরা, তোমাদের সর্দারের সন্ধানে আমি এসেছিলাম...

একটা ভয়ার্ত ভাব নিয়ে তাকালো ফুল্লরা নূরের মুখের দিকে।

বললো নূর–ভয় নেই তোমাদের সর্দারকে আমি গ্রেপ্তার করতে আসিনি, আমি জানতে এসেছিলাম কোথায় সে।

ফুল্লরা বললো–তুমি চালাকি করে জানতে চাও আমাদের সর্দার কোথায়, তাই না?

না, শুধু জানতে চাই সে কেমন আছে।

ও দরদ দেখে বাঁচি না।

সত্যি–তুমি বিশ্বাস করো ফুল্লরা আমি কোনো কুমতলব নিয়ে আসিনি।

তুমি কে? আর বারবার কান্দাই জঙ্গলে আসো কেন?

জানি না কেন আসি, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে বলে নূর–যদি বলি তোমাকে ভালবাসি।

সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা গম্ভীর করে ছুটে পালালো ফুল্লরা।

নূর হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ তার চলে যাওয়া পথের দিকে, তারপর সে অগ্রসর হলো তার গাড়িখানা যেখানে রয়েছে সেদিকে।

সন্ধানে এসেছিলো সে তার পিতার। যদিও জানতো তাকে খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টকর, তবু নূর নিশ্চুপ থাকতে পারেনি। না জানি গুলীটা তার কতখানি ক্ষতি করেছে।

কান্দাই জঙ্গল তাকে মাঝে মাঝে হাতছানি দিয়ে ডাকতো। ফুল্লরা তার মনকে আকর্ষণ করে। নিয়েছিলো। নিজের অজ্ঞাতে সে ভালবেসে ফেলেছিলো ফুল্লরাকে।

নূর অত্যন্ত সজাগ ছিলো।

তার মনের কথা কেউ জানতো না বা কাউকে সে জানাতে চাইতো না।

কাজের ব্যস্ততায় হারিয়ে যেতো তার মনের কথা।

সর্বক্ষণ ব্যস্ত থাকতে হতো নূরকে।

যখন নূর বিশ্রাম করতো, কোনো কাজ থাকতোনা তার হাতে তখন সে ভাবতো, মনে পড়তে একটা মুখ–ফুলের মত সুন্দর নিষ্পাপ একটি মুখ, সে মুখ ফুল্লরার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসতো তার বুক চিরে, কোনোদিন কি সে পাবে তাকে।

আজও নূর বিষণ্ন মনে ফিরে এলো।

ফুল্লরা মায়ামৃগ, তাকে পাওয়া সম্ভব নয়। যদি তাকে জোর করে ধরে আনে তাতে লাভ হবে না, কারণ বনের হরিণী সহজে বশ মানবে না।

গাড়িসহ ফিরে এলো নূর বাংলোয়।

দারোয়ান বন্দুক হাতে গেটের ওদিকে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে দেখেই মনে পড়লো ওর হাতের বন্দুকখানা তার আব্বুকে আহত করেছে, না জানি কি অবস্থায় আছে সে!

*

জাভেদসহ ফিরে এলো রাণী জম্বুর পর্বতে। ভূগর্ভ আস্তানায় আনন্দ উৎসব শুরু হলো। অনুচরগণ নাচগানে আস্তানা মুখর করে তুললো। রাণী জম্বুর পর্বত ছেড়ে চলে যাবার পর ঝিমিয়ে পড়েছিলো সবাই। এবার যেন সজীব হয়ে উঠলো রাণীর আস্তানা।

রাণী কিন্তু ভীষণ গম্ভীর হয়ে পড়েছে।

তার অতি পরিশ্রমের ধন মাণিকটি হারিয়ে গেছে। যতক্ষণ না তা ফিরে পায় ততক্ষণ স্বস্তি নেই।

রাণী যখন তার মাণিক হারিয়ে উদভ্রান্তের মত হয়ে পড়েছিলো তখন তার গলার লকেটে ক্ষুদে ওয়্যারলেসে ভেসে এলো সুমিষ্ট অথচ মৃদু একটা সুর, সঙ্গে সঙ্গে রাণী সজাগ হয়ে উঠলো এবং গলায় ঝুলানো লকেটখানা তুলে ধরলো মুখের কাছে।

ছোট্ট ক্ষুদে একটা সুইচ টিপলো।

খুলে গেলো লকেটখানা।

ভেসে এলো মিঃ চৌধুরীর কণ্ঠস্বর–রাণী, মনিষা দ্বীপে আবার ভীষণ মহামারী দেখা দিয়েছে....এখানে প্রচুর ওষুধ এবং খাদ্যের প্রয়োজন...।

..এমন মুহূর্তে এ সংবাদ তুমি আমাকে দিলে যখন আমি মস্তবড় একটা দুশ্চিন্তায় আছি...

...কি এমন ঘটনা ঘটেছে রাণী, আমাকে জানাওনি কেন.. বলবে আমাকে....

...বলবো, আমি বহু চেষ্টা করে পেয়েছিলাম একটি মহামূল্যবান পাথর যার নাম মাণিক...

... কি হলো সেটা...

..আমি হারিয়েছি...তবু আমি যাবো মনিষা দ্বীপে....আহার, ওষুধ তুমি সগ্রহ করবে আর আমি করবো খাদ্য এবং পথ্য...

ঠিক আছে....তুমি এখন কোথায়...

…বলবো না, কারণ জানতে চেয়ে না…

…রাণী কতদিন তোমাকে দেখিনি…

… মনিষায় দেখা হবে…

…কিন্তু তোমাকে কি খুঁজে পাবো সেখানে…

…কবে আমি তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরে বলো তো…

…রাণী হাঁপিয়ে উঠেছি…সত্যি তুমি কতদূরে….

..লক্ষীটি রাগ করো না, অনেক কাজ…কাজ শেষ হলেই মিলিত হবো আমরা…এবার তুমি কাজে মনোযোগ দাও, কেমন….

ক্ষুদ্র ওয়্যারলেসের ক্ষুদে চাবি টিপে বন্ধ করে দিলো রাণী।

কে যেন কাঁধে হাত রাখলো ওর।

চমকে ফিরে তাকালো রাণী।

চন্দনা হেসে বললো–বুঝেছি কার সঙ্গে কথা হচ্ছিলো।

তবে আবার কেন, যা আমাকে একা থাকতে দে।

তা হয় না রাণী, সব আমি শুনেছি।

বস্ তবে।

বসলো চন্দনা।

বললো রাণী–সব যদি শুনেই ফেলেছিস তবে বল এখন কি করবো? আমার মাণিক খুঁজে বের করতেই হবে, নাহলে আমি স্বস্তি পাবো না। তাছাড়া ইন্দ্রনাথকে আমরা অতিকণ্ঠে এবং সাবধানে এনেছি। ওর দ্বারাই কাজ সমাধা করতে হবে। কারণ ওর দ্বারাই সন্ন্যাসী ওটা হস্তগত করেছে।

সব জানি, আরও জানি ইন্দ্রনাথের স্বাভাবিক সংজ্ঞা এখন নেই। সে কে, কোথা হতে তাকে সন্ন্যাসী এনেছিলো তা জানে না ইন্দ্রনাথ। শুধু সে জানে তার নাম ইন্দ্রনাথ....

আশ্চর্য বটে! সন্ন্যাসীর পরশে যাদু আছে, সেই যাদু দ্বারা সে বশীভূত করে মানুষকে।

যেমন তোমাকে সন্ন্যাসী যাদু করেছিলো। নাহলে তুমি অমন করে সন্ন্যাসী আর যুবকটিকে বন্দী করে রাখতে না।

সত্যি চন্দনা তাই। যারা গুপ্তচরের মত গোপনে আমার আস্তানায় প্রবেশ করলো আর আমি কিনা তাদের হত্যা না করে বন্দী করে রাখলাম।

জানি তোমার দুর্বলতা কোথায় ছিলো। তরুণটির প্রতি তোমার একটা মায়া এসে পড়েছিলো।

এ কথা সত্য চন্দনা, ওর প্রতি আমার কোনো ক্রুদ্ধভাব জন্মায়নি তাই আমি....

তাই তুমি পারোনি তাদেরকে হত্যা করতে বা কোনো নির্মম শাস্তি দিতে।

চন্দনার কথা শেষ হতে না হতে একজন অনুচর ছুটে এলো এবং রাণীকে কুর্ণিশ জানিয়ে বললো–রাণীজী, বড় দুঃসংবাদ!

বলো কি হয়েছে?

ইন্দ্রনাথ পালিয়েছে। আজ রাত থেকে তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

ইন্দ্রনাথ পালিয়েছে...বলো কি রথীন্দ্র।

হাঁ রাণীজী, আমরা তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।

সত্যি বড় আশ্চর্য কথা। বললো চন্দনা–তারপর একটু থেমে বললো–ওকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে রাখা ঠিক হয়নি রাণী! না জানি সে কোন্ পথে কোথায় পালালো।

রাণীর দুচোখে দিয়ে যেন আগুন টিকরে পড়লো, বললো–তোমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে পালালো কি করে?

রথীন্দ্র কথা বলতে পারছে না, তার মুখখানা ভয়ার্ত হয়ে উঠেছে, একবার সে ভয়কাতর দৃষ্টি নিয়ে তাকালো রাণীর মুখের দিকে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে ইন্দ্রনাথ সেখানে প্রবেশ করলো–তার হাতে একটা রক্তমাখা ছোরা, বাম হাতের মুঠায় একটি কাগজের মোড়ক বা পুটলি।

সবাই স্তম্ভিত হতবাক, ইন্দ্রনাথ কাগজের পুটলিখানা রাণীর সম্মুখে রাখলো।

বিস্ময় নিয়ে তাকালো রাণী কাগজের মোড়কখানার দিকে।

[পরবর্তী বই মনিষা দ্বীপ]

পূর্ববর্তী:

« ৭.১১ নর কঙ্কাল

পরবর্তী:

৭.১৩ মণিষা দ্বীপ »